Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ মোমেনা আক্তার

রোলঃ 23090120345

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ মোমেনা আক্তার

রোলঃ 23090120345

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ মোমেনা আক্তার, আইডিঃ 23090120345 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছাঃমোমেনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ মোমেনা আক্তার

আইডিঃ 23090120345

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 7

নামাজের প্রকারভেদঃ 7

নফল নামাজের অর্থ ও সংজ্ঞাঃ 8

নফল শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থ: 8

১ম অধ্যায়ঃ নফল নামাজের প্রকারভেদঃ 9

তাহিয়্যাতুল মসজিদ 9

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ 11

ইশরাকের নামাজ 12

সালাতুদ্দোহা বা চাশতের নামাজ 13

আওয়াবীনের নামাজ 16

তাহাজ্জুদ নামাজ (কিয়ামুল লাইল) 18

★কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) ও খুসুফ (চন্দ্রগহণ) এর নামাজ 32

★ ইস্তিখারার নামাজ 35

সালাতুত তাসবিহ 44

সালাতুল হাজত : প্রয়োজন পূরণে নামায 46

সালাতুত তাওবা 59

সালাতুত শোকর (শুকরিয়ার নামাজ) 65

৩য় অধ্যায়ঃ নফল নামাজের গুরুত্ব ও উপকারিতাঃ 66

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : 66

২.রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য : 67

৩. জাহান্নামের আগুন হারাম : 68

৪.বেশি বেশি নফল জান্নাত লাভের মাধ্যম: 69

৫.ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ : 69

৬.মর্যাদা উন্নতকরণ : 70

৭. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি: 71

চতুর্থ অধ্যায় : কুরআনের আলোকে নফল নামাজ 71
১. নফল ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতসমূহঃ..... 71
২.সাহাবায়ে কেরামের নিকট নফল নামাজের মর্যাদা: 72
৩.কুরআনের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত নফল ইবাদতের মর্যাদা:..... 74
পঞ্চম অধ্যায় : হাদীসের আলোকে নফল নামাজ..... 77
১.রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নফল নামাজের অভ্যাস:..... 77
২. হাদীসে নফল নামাজের ফজিলত..... 78
৩.নফল নামাজ সম্পর্কিত হাদিস 79
..... 80
ছয় অধ্যায় : নফল নামাজের ব্যক্তিগত,পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবঃ 81
১. ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব..... 81
২. পারিবারিক জীবনে প্রভাব 82
৩. সামাজিক জীবনে প্রভাব..... 84
অধ্যায় ৭: নফল নামাজের প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট 87
১.নফল নামাজ ও বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ 87
২. নফল ইবাদতের অন্যান্য প্রকারভেদ: 90
৩. নফল ইবাদতের সঠিক প্রতিপালন :..... 92
৪.নফল ইবাদতে গোপনীয়তা ও প্রদর্শন:..... 95
অষ্টম অধ্যায়ঃ উপসংহার..... 96

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তায়া'লার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলো মানুষ। যাকে আরবিতে বলা হয় "*আশরাফুল মাখলুকাত*"। সৃষ্টির সেবা জীব হয়েও আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় জানা অজানায়, শয়তানের প্ররোচনায়, নফসের ধোঁকায়। তাই এই গুনাহ মাফের জন্য সালাতের মাধ্যমে দোয়া করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হয়।

আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ও প্রার্থনা নিবেদনের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ। কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হতে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। নামাজের হিসাব সঠিক হলে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর নামাজের হিসাব বাতিল হলে তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং এটি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলিমের জন্য একটি অবশ্যকরণীয় ইবাদত। এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, ঈমান প্রকাশ পায় এবং এটি মানুষকে আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকতে শেখায়। নামাজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, মানবজীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

নামাজের প্রকারভেদঃ

নামাজ মূলত ২ প্রকার:

১.ফরজ (বাধ্যতামূলক),
২.সুন্নাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা সুন্নাতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ) বা নফল।

এছাড়াও ফরজ নামাজের মধ্যে ওয়াজিব নামাজ অন্তর্ভুক্ত, যা ফরজ না হলেও অবশ্য পালনীয়। এই প্রকারভেদগুলি নামাজের গুরুত্ব ও বাধ্যবাধকতার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

এখানে প্রতিটি প্রকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১.*ফরজ নামাজ*: এই নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। ফরজ নামাজ আদায় না করলে গুনাহ হয়।

ক) *ফরজে আইন:* যে নামাজ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

খ) *ওয়াজিব নামাজ:* এটি ফরজের কাছাকাছি পর্যায়ের নামাজ, যা অবশ্যই পালন করতে হয়।

২.*সুন্নাত বা নফল নামাজ:* সুন্নাত নামাজে হলো রাসুল (সা.) এর দেখানো পথ ও আদত। এর মধ্যে কিছু সুন্নাতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত) বলা হয়, যা নিয়মিত আদায় করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

ফরজ, ওয়াজিব, এবং সুন্নাত নামাজ ছাড়া অন্যান্য যেকোনো নামাজই নফল নামাজ। এই নামাজগুলো স্বেচ্ছায় আদায় করা হয় এবং এতে অনেক সওয়াব রয়েছে।

নফল নামাজের অর্থ ও সংজ্ঞাঃ

নফল' একটি আরবি শব্দ (النفل) যার অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ বা ঐচ্ছিক কাজ। ইসলামের পরিভাষায়, ফরজ বা ওয়াজিব (আবশ্যিক) বিধানের বাইরে অতিরিক্ত যে ঐচ্ছিক ইবাদতগুলো আদায় করা হয়, তাকে নফল বলে। এই শব্দটির উৎপত্তি আরবি *'নফলা''* ধাতু থেকে, যার সাধারণ অর্থ হলো 'অতিরিক্ত' বা 'যা মূলের অতিরিক্ত'। এই শব্দটির বহুবচন হলো *'আনফাল' (أنفال)*। নফল ইবাদতের মধ্যে নফল নামাজ, নফল রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা সাধারণ বাধ্যতামূলক ইবাদতের বাইরে গিয়ে করা হয়।

নফল শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থ:

- **আরবি উৎপত্তি:** *'নফল' শব্দটি আরবি 'نفل' (নফলা) ধাতু থেকে উদ্ভূত। যার বহুবচন হলো 'আনফাল' (انفل)।*

- **আভিধানিক অর্থ:** এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ', 'ঐচ্ছিক' বা 'বাধ্যতামূলক নয় এমন' বা অতিরিক্ত পুরষ্কার।

- **ইসলামি পরিভাষায়:** পরিভাষায় নফল সালাত বলা হয়- فِعل ما ليس بفرض ولا واحب. و كلّ سنتٍ نافلة لأنها زائدة على الفرض وليس كل نفل سنة.

"শরিআর এমন কর্ম,যা আবশ্যিক [ফরয-ওয়াজিব] নয়। আর নফল নামাজ বলতে ফরয ও ওয়াজিব সালাত ব্যতীত শরীয়তসিদ্ধ অন্যান্য সালাতকে নফল সালাত বলা হয়, যার মধ্যে সুন্নত সালাতও শামিল রয়েছে।"

সংক্ষেপে, নফল একটি আরবি শব্দ যার মাধ্যমে এমন সব কাজ বা ইবাদতকে বোঝানো হয় যা আবশ্যিক না হয়েও আদায় করলে অতিরিক্ত সওয়াব বা প্রতিদান লাভ করা

১ম অধ্যায়ঃ নফল নামাজের প্রকারভেদঃ

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

মাসজিদে প্রবেশ করার পরই না বসে দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' বা 'দুখুলুল মাসজিদ' নামাজ আদায় করতে হয়।

আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إذ دجل أحدكم المسجد فلا يجلس حتيى يصلي ركعتين.

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দুই রাকাত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামাজ) আদায় করে বসে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৫৩৯]

- *তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সম্পর্কে জরুরি কিছু কথা:*

(১) মসজিদে প্রবেশের পরপর না বসে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়। এর নাম তাহিয়্যাতুল মাসজিদ। এটি মসজিদের হক (অধিকার) এবং মসজিদের প্রতি আগন্তুকের পক্ষ থেকে সৌজন্যবোধ। আলিমগণ বলেন, যদি কেউ না পড়ে ভুলে বসে পড়ে এবং তাৎক্ষণিক বোধোদয় হয়, তাহলে সাথে সাথে ওঠে দাঁড়িয়ে পড়ে নেবে।

(২) তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব ও নফল। তবে, এ ব্যাপারে হাদিসে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তাই, এই নামাজ পড়া উচিত। মসজিদে এসে কোনো কারণ

ছাড়া এই নামাজ আদায় না করে বসে পড়াকে আলিমগণ মাকরুহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন। [ইমাম নববি, শারহু মুসলিম: ৩/৩৪]

(৩) বিশেষ কোনো নিয়ম নেই; সাধারণ নফল বা সুন্নাতের মতো দুই রাকাত নামাজ পড়বেন।

(৪) যদি মসজিদে ঢুকে দেখেন, জামাত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে জামাতে শামিল হবেন। আর যদি দেখেন, পর্যাপ্ত সময় আছে, তাহলে না বসে প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবেন। এরপর যদি সুন্নাত থাকে, তবে সুন্নাত আদায় করবেন। সুন্নাত পড়ার সময় আছে, কিন্তু সুন্নাত+তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ার সময় নেই, তখন শুধু সুন্নাত পড়বেন। তাহলে, অনেক আলিমের মতে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদও আদায় হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

(৫) আজান চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথমে আজানের জবাব দেবেন, এরপর তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবেন। [ইমাম ইবনু রজব, ফাতহুল বারি: ৪/২১০]

(৬) মোট ৫ টি সময়ে নামাজ পড়া নিষেধ। সহিহ মুসলিমের (হাদিস নং ১৮১৪) বর্ণনায় এসেছে: (এক) সূর্যোদয়, (দুই) সূর্যাস্ত ও (তিন) ঠিক দুপুরের সময় নামাজ আদায় করা যাবে না, যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকে, যতক্ষণ না তা সামান্য হেলে যায়। অন্য বর্ণনায় (সহিহ মুসলিম: (১৮০৫) এসেছে, (চার) ফজরের ফরজ নামাজ পড়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং (পাঁচ) আসরের ফরজ নামাজ পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (নফল) নামাজ পড়া যাবে না। যেহেতু এই সময়গুলোতে নামাজ আদায় করা জায়েয নেই, তাই এই সময়গুলোতে মসজিদে প্রবেশ করলে কোনো নামাজই পড়বেন না; এমনকি তাহিয়্যাতুল মসজিদও না। এটিই অধিকাংশ আলিমের মত। তবে, কোনো কোনো আলিম বলেছেন, সাধারণভাবে মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত পড়া ব্যতীত না বসার জন্য বলা হয়েছে হাদিসে (সহিহ বুখারি: ১১৬৩) তাই, যেকোনো সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেই এই নামাজ পড়া যাবে। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, তাহিয়্যাতুল মসজিদের হুকুম ভিন্ন।

(৭) জুমু'আর দিনে খুতবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে কী করণীয়, তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশ আলিমের মত হলো, এমতাবস্থায় বসে যাবে এবং খুতবা শুনবে; কারণ খুতবা শুনা ওয়াজিব। তবে, আলিমগণের একাংশের মতে, প্রথমে দ্রুত দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে নেবে, এরপর খুতবা শুনবে। দুই পক্ষেই হাদিসের বিভিন্ন দলিল রয়েছে।

(৮) ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ মসজিদে ঢুকে, তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ পড়বে না, তাহিয়্যাতুল মসজিদও না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘ফজরের (ওয়াক্ত শুরুর) পর দুটো সিজদা (অর্থাৎ দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত) ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ আদায় করবে না।’’ [ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ১২৭৮; হাদিসটি সহিহ]

তবে, আলিমগণের একাংশ মত দিয়েছেন, যেহেতু হাদিসে স্পষ্টভাবেই তাহিয়্যাতুল মসজিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ফজরের ওয়াক্তে এটি আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ কোনো নিষেধ করা হয়নি, তাই এই সময়ে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়া যাবে।

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ

অজুর পর দুই রাকাত নামাজের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। এই নামাজকে বলা হয় ‘তাহিয়্যাতুল অজু’।

এই নামাজের ফজিলত ও নিয়মাবলী আলোচনা করা হলো।

উকবাহ ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত,
مَا من مُسلِمٍ يتو ضـَّأُ فيحسن وُ ضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّي رَكعتينِ مُقْبِلٌ عليهما بقلبه وَ وَخهه إلاَّ وَخبت لهُ الجنَّةُ.

তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করবে, তারপর দাঁড়িয়ে তার চেহারা ও মনকে নামাজের দিকে ফিরিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।’’ [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ৪৪১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি নবিজির দেখানো পদ্ধতিতে অজু করবে, এরপর এমনভাবে দুই রাকাত নামাজ পড়বে যে, সে তার মনের মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা আনবে না, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ১৫৯]

আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী সা. বিলাল রাযি. কে বলেছেন, ‘‘ হে বিলাল, তুমি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলো যা তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর করেছ এবং যে ব্যাপারে তুমি

সবচেয়ে বেশি আশাবাদী; কেননা আমি জান্নাতের সম্মুখে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল রাযি. বললেন, "আমি তেমন কোনো আশার আমল করিনি তবে আমি রাতে বা দিনে যখনই অজু করেছি তখনই আমি ওই অজু দ্বারা যতটুকু সম্ভব সালাত পড়েছি।"
(বুখারী-১৭/১০৯৮)

❖ তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের নিয়মাবলী:

(১) অজু অথবা গোসলের পর তাহিয়্যাতুল অজুর দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব এবং নফল; এটি ফরজ বা ওয়াজিব নয়। সাধারণ নফল বা সুন্নাত নামাজের মতো দুই রাকাত নামাজ পড়বেন। বিশেষ কোনো নিয়ম নেই।

(২) অজু করার পরপরই এই নামাজ পড়তে হয়। আলিমগণ বলেন, অজুর অঙ্গগুলো পুরোপুরি শুকানোর আগেই এটি পড়তে শুরু করা উচিত। তার মানে এই নয় যে, অজুর পর অজুর অঙ্গগুলো মুছা যাবে না। মোটকথা, অজুর পর অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগেই এই নামাজটি পড়া।

(৩) অজুর পর বিভিন্ন ওয়াক্তের সুন্নাত নামাজের আগে এটি পড়া যাবে। আবার, কেউ কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো কারণে অজু করলেও এই নামাজ পড়া যাবে।

(৪) অজুর পরপর মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিয়্যাতুল অজু এবং তাহিয়্যাতুল/দুখুলুল মসজিদ একত্রে আদায় করা যাবে। মানে ২ নামাজের নিয়ত একত্রে করে শুধু দুই রাকাত পড়লেই চলবে।

(৫) এই নামাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমল করতেন বিলাল (রা.)। আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তাঁকে বিরাট মর্যাদা দান করেছেন।

ইশরাকের নামাজ

ইশরাক অর্থ প্রভাত, সকাল, সূর্যোদয়। ফজরের নামাজের পর সেই স্থানেই বসে, জিকির আজকার, দুআ দরুদ, ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবী কোন

কথা না বলা। এভাবে যখন সূর্য উদিত হয়ে যায় এর দশ বারো মিনিট পর যে দুই/চার রাকাআত সালাত পড়া হয় সেই সালাতকে ইশরাকের সালাত বলে।
তবে যদি সালাত পড়ে দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে সূর্য উদয় বারো মিনিট পর যদি ইশরাক পড়া হয়, তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে কিছুটা কম হবে।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
> مَنْ صَلَّى الْغَداةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسلَّمَ: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تامَّةٍ.

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহ তায়ালার জিকির করে, তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরার সওয়াব রয়েছে।"
আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও উমরার সওয়াব)।
(তিরমিজি শরীফ: ৫৮৬)

আরেক বর্ণনায়, হযরত হাসান বিন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,
"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত পড়ে, তারপর আল্লাহর জিকির করতে থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত, তারপর চার রাকআতের বা চার রাকআতের সালাত আদায় করে, তাহালে জাহান্নামের আগুন তার চামড়া স্পর্শ করবে না।"
(আবু দাউদ শরীফ)

সালাতুদ্দোহা বা চাশতের নামাজ

'দোহা' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো, দিনের প্রথম প্রহর। ফার্সিতে একে বলা হয় 'চাশত'। অতএব, দোহা এবং চাশত একই নামাজ। পরিভাষায় সূর্যোদয়ের পর সূর্যের তাপ কিছুটা প্রখর হওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয়, সেটিকেই দোহার নামাজ বলা হয়।

যখন ইশরাকের নামাজ পড়ার পর এবং তার পরবর্তী সময় শুরু করে দ্বিপ্রহরের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চাশতের নামাজ পড়া যায়। অর্থাৎ সূর্য যখন এক মিটার পরিমাণ উপরে ওঠে যায় এবং সূর্য ওঠার পরবর্তী সময়ে ইশরাকের নামাজ আদায় করার পর কিছুক্ষণ জিকির করে চাশতের নামাজ আদায় করা হয়।

- *চাশত নামাজের রাকাআত সংখ্যা:*

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চাশতের নামাজ চার রাকাত পড়তেন। তাই আমরাও চার রাকাত পড়ে থাকি।
চাশতের নামাজের রাকাত সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ রাকাত তবে হাদিসের বর্ণনা অনুসারে ৪, ৮ এবং ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরুপ প্রমাণিত। **তবে আট রাকাআত আদায় করা উত্তম।**

উম্মু হানী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের তাঁর ঘরে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন; এবং আট রাকাত সালাত করেছেন।তিনি বলেছেন যে,আমি আর কখনো অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত দেখিনি। তবে কিরাআত ছাড়া তিনি রুকু এবং সিজদায় তিনি পূর্ণ ধীরস্থিরতা বজায় রেখেছিলেন এবং প্রতি দুই রাকাত অন্তর অন্তর সালাম ফিরিয়ে ছিলেন।
(বুখারী, হাদিস নংঃ ২০৭)।

- *চাশতের নামাজের ফজিলত সম্পর্কে কতিপয় হাদিস*

১.সালাতুত দুহা বা চাশতের নামাজ হযরত বুরাইদা (রাজি.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, “মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সাদকা করা।”
সাহাবায়ে কিরাম (রাজি.) বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ! কার শক্তি আছে এই কাজ করার?”তিনি (সা.) বললেন, “মসজিদে কোথাও কারও থু থু দেখলে তা ঢেকে দাও, অথবা রাস্তায় কোনো ক্ষতিকারক কিছু দেখলে সরিয়ে দাও, তবে এমন কিছু না পেলে, চাশতের দুই রাকাত নামাজই এর জন্য যথেষ্ট।”

এই হাদিসে চাশতের নামাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের কথাই বোঝানো হয়েছে এবং চাশতের নামাজ ৩৬০টি সাদকার সমতুল্য। (১) আবু দাউদ শরীফ, ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। (২) মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

২.আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে আমল করার ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) দিয়েছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। ক. প্রতি মাসের প্রথম তিন দিন রোজা রাখা; খ. চাশতের নামাজ (সালাতুদ্ দুহা) আদায় করা এবং গ. ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিতরের নামাজ আদায় করার। (বুখারি, হাদিস নং-২৭৪; মুসলিম, হাদিস নং-১৫৬০)

৩.রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের শরীরের প্রতিটি জোড়ার জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) প্রতিদিন সকালে সদাকাহ দিতে হয়। (জেনে রেখো) প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) সদাকাহ; প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) সদাকাহ; প্রত্যেক তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সদাকাহ; প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার) সদাকাহ; সৎ কাজের আদেশ সদাকাহ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করাও সদাকাহ। আর এসবের পক্ষ হতে দোহার (চাশতের) দুই রাকাত নামাজই যথেষ্ট হবে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৫৫৬]

৪.হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আদম সন্তান, তুমি দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাকাত (নামাজ) আদায় করো; আমি তোমার (দিনের) শেষ ভাগের জন্য যথেষ্ট হবো।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৪৭৫; হাদিসটি সহিহ]

হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন, আল্লাহ তার বাকি দিনের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবেন এবং তার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। [আল্লামা মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযি: ২/৪৭৮]

একজন সালাফ (পূর্বসূরি) বিদ্বান বলেন, গুনাহ ত্যাগের জন্য চাশতের নামাজের চেয়ে কার্যকর আর কিছু পাইনি।

চাশতের নামাজ মুমিনদের জন্য উপহারস্বরূপ। এটা আদায় করলে আল্লাহ বিপুল পুণ্য ও সওয়াব দেবেন। আখেরাতে এর প্রতিদান দেবেন। তবে এই নামাজ না পড়লে কেউ গুনাহগার হবে না।

সালাতুত দোহা নামাজের অনেক ফজিলত রয়েছে, যেমন—নবী (সা.)-এর সুন্নাত পালন, ফজর ও আসর বা ইশরাক ও চাশত মিলে হজ ও উমরার সওয়াব লাভ, এবং আধ্যাত্মিক শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ যা নিয়মিত আদায় করা উচিত।

আওয়াবীনের নামাজ

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামাজ 'সালাতুল আওয়াবিন' (আল্লাহ-অভিমুখীদের নামাজ)

আওয়াবীন নামাজের পরিচয়:

আওয়াব (أَوَّاب) শব্দের অর্থ হলো বারবার প্রত্যাবর্তনকারী। অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী—আল্লাহমুখী ব্যক্তি। সলাতুল আওয়াবিন হলো, আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারীদের নামাজ।

মাগরিবের ফরয ও সুন্নত নামাজ পড়ার পর থেকে এশার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত যে নফল সালাত পড়া হয়, তাকে আওয়াবীন নামাজ বলে।
তবে কিছু হাদীসে চাশতের
সালাতকেও আওয়াবীন সালাত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য উলামাদের মতে চাশতের সালাত আলাদা আর আওয়াবীনের সালাত আলাদা স্বতন্ত্র। চাশতের সালাতের সময় হল সূর্য উদিত হয়ে রোদ তীব্র হবার পর পড়া হয়। আর ***আওয়াবীনের সালাত মাগরিবের ফরযের পর পড়া হয়।***

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দোহার (চাশতের) নামাজের প্রতি কেবল সে-ই যত্নবান হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনকারী। আর এটি 'সলাতুল আওয়াবিন' বা আল্লাহর দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনকারীদের নামাজ।" [ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, আস-সহিহ: ১১১৬; শায়খ আলবানি, সহিহুল জামি': ৭৬২৮; হাদিসটি হাসান সহিহ]

ইমাম ইবনু মুবারক (রাহ.) সংকলিত 'যুহদ' গ্রন্থে এসেছে, তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির (রাহ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ে, সে আওয়াবিনের নামাজ পড়ে।" [শায়খ আলবানি, সিলসিলা দ্বঈফাহ: ৪৬১৭; হাদিসটি দুর্বল]

অন্য হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত নফল নামাজ পড়বে, এসবের মাঝখানে বাজে কোনো কথা বলবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ১২ বছরের নফল ইবাদাত করার নেকি দান করবেন।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৪৩৫; ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ১১৬৭; হাদিসটি বেশ দুর্বল]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম শাওকানি (রাহ.) বলেন, আওয়াবিনের নামাজ শুধু দোহার (চাশতের) সময়েই হতে হবে, এমনটি জরুরি নয়। এটি দোহার সময়ের পাশাপাশি মাগরিব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়েও হতে পারে। যেহেতু দুর্বল বর্ণনা অনেকগুলো এসেছে এবং সালাফদের (পূর্বসূরি নেককারদের) বিরাট অংশ এ সময় (নফল) সলাত আদায় করতেন বলে প্রমাণিত আছে, সেহেতু বিষয়টির পক্ষে এটি একটি দলিল। আল্লামা মুবারকপুরি (রাহ.) এতে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম মুনাভি (রাহ.)-ও এ ধরনের কথা বলেছেন। এই তিনজনই বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। [নাইলুল আওত্বার, তুহফাতুল আহওয়াযি, ফায়দ্বুল ক্বাদির]

তাছাড়া আলিমগণের একটি অংশ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আওয়াবিন পড়তেন।

এই পর্যায়ে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে: মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 'আওয়াবিন নামাজ' পড়ার বিষয়ে কোনো সহিহ বর্ণনা নেই। তবে, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নফল নামাজ পড়ার ব্যাপারে একাধিক সহিহ হাদিস রয়েছে এবং সালাফদের মাঝে এর ব্যাপক নজির রয়েছে।

সাহাবি হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা পর্যন্ত নফল নামাজে রত থাকলেন। [ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২২৯২৬; হাদিসটি সহিহ]

আনাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন ও নফল নামাজ আদায় করতেন। [ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৩২১; হাদিসটি সহিহ]

- *আওয়াবীন নামাজের রাকাআত সংখ্যা-*

এ সালাত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাকাআত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। ছয় রাকাআতের ফযীলত হাদীসে এসেছে। আবার এর চেয়ে কমবেশিও করা যাবে।

হযরত আবু হুযাইফা রাঃ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلعم المَغربَ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى العِشَاءُ.

" তিনি রাসূল সা. এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। ফরয শেষে নফল পড়তে লাগলেন এশা পর্যন্ত।"

(সহীহ ইবনে খুজাইমা,১১৯৪)

তাহাজ্জুদ নামাজ (কিয়ামুল লাইল)

তাহাজ্জুদ নামাজ হলো এক বিশেষ নফল ইবাদত যা রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে জেগে আদায় করা হয়। এটি নবী করিম ﷺ এর অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত ছিল। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাজকে তাহাজ্জুদ নামাজ বলা হয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন —

"রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো, এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত; হয়তো তোমার রব তোমাকে প্রশংসনীয় এক অবস্থানে দাঁড় করাবেন।"

(সূরা আল-ইসরা: ৭৯)

কিয়ামুল লাইল- রাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায, মুমিনের মর্যাদার সিঁড়ি। জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম উপায়। সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহর একান্ত ও প্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ ছাড়েননি। ছুটে গেলে কাযা করতেন। নিজে আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করতেন।

- *তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাআত সংখ্যা*

তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাআত সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই।তবে দুই দুই রাকাআত করে চার রাকাআত ; থেকে শুরু করে যত ইচ্ছা রাকাআত আদায় করা যায়। উলামাদের পরামর্শ হলো- নূন্যতম চার রাকাআত আদায় করা। যে কয় রাকাআতই পড়া হোক, তা নিয়মিত আদায়ের অভ্যাস করা।

যেমন হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করেন, রমজানে নবীজী সা. এর নামাজ কেমন হতো? তিনি উত্তরে বলেন,হযরত রাসুলুল্লাহ সাঃ রমজানে এবং রমজানের বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না! এরপর আরও চার রাকাআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তো বলাই বাহুল্য! এরপর তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।
(সহীহ বুখারী:১/১৫৪)

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কাইস বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করলাম, নবিজী বিতরে কত রাকাআত পড়তেন? উত্তরে তিনি বলেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাআতের কম এবং তের রাকাআতের বেশি পড়তেন না।
(আবু দাউদ:১/১৯৩)

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল, হযরত রাসুলুল্লাহ সাঃ কখনও তাহাজ্জুদের নামাজ চার রাকাআত পড়তেন, কখনও ছয় রাকাআত পড়তেন। কখনও আট রাকাআত পড়তেন, কখনও দশ রাকাত পড়তেন। এর চেয়ে বেশি পড়া যাবেনা এমন নয়। যেহেতু এটি নফল সালাত, তাই যত বেশি পড়া যায় ততই সওয়াব।

- তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম:

প্রথমে হালকা দুই রাকাত দিয়ে শুরু করা। প্রথমে ছোট সূরা দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত আদায় করবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন।
আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন-

افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

শুরুতে হালকা করে দুই রাকাত আদায় করতেন।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৫৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৬৬৮২।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

"তোমাদের কেউ যখন রাতে উঠবে, সে যেন প্রথমে হালকা দুই রাকাতের মাধ্যমে শুরু করে।" -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩২৩।

- *তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলতঃ*

১.সর্বোত্তম নফল সালাতঃ

তাহাজ্জুদের মর্যাদা অপরিসীম। ফরয সালাতের পরে উত্তম সালাত হলো- তাহাজ্জুদের সালাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَمَّنۡ ہُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا یَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَۃَ وَیَرۡجُوۡا رَحۡمَۃَ رَبِّہٖ ؕ قُلۡ ہَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ٪

"তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে।"
—আয্-যুমার - ৯
২. আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া:

নবী ﷺ বলেছেন,
"রাতে অল্প কিছু সময় তাহাজ্জুদে দাঁড়াও, এটা তোমাকে তোমার রবের প্রিয় বানাবে।"
(তিরমিযি)

৩.*জান্নাতী ও মুমিন ব্যাক্তির বৈশিষ্ট্য* :

জান্নাতী মুমিন বান্দাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা রাত্রির শেষাংশে জাগ্রত থেকে নামাজ পড়ে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বর্ণনা দিয়েছেন যে,
كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

"তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত।"

৪. *তাহাজ্জুদ নামাজ বিশেষ মর্যাদার নামাজ:*

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

“ফরজের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত।”

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

“নিশ্চয়ই জান্নাতে কিছু কক্ষ রয়েছে যার বহির্ভাগ ভেতর থেকে দেখা যাবে এবং ভেতরের ভাগ বাইরে থেকে দেখা যাবে। এরপর এক বেদুইন ব্যাক্তি দাড়িয়ে বলল, এটি কার জন্য, হে আল্লাহর রসুল? তিনি বললেন, যে ভালো কথা বলল,খাবার খাওয়ালো, দিনের পর দিন রোজা রাখল এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর উদ্দেশ্য সালাত পড়ল।

(তিরমিজি)

৫.মুমিনের মর্যাদার সোপান:

জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে নবীজির খেদমতে আসতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মাঝে ওহীর জ্ঞান ও উর্ধ্বজগতের খবর পৌঁছানোর গুরুদায়িত্বটা ন্যস্ত ছিল তাঁর কাঁধে। নবীজীর কাছে আসতেন এবং কিছু উপদেশ ও নসীহত শুনিয়ে আবার সরে যেতেন মানবপরিবেশ থেকে। একদিন উপদেশ শোনানোর পর তিনি নবীজীকে একটি অসাধারণ দর্শন জানালেন-

يَا مُحَمَّدُ! شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

قال المنذري في الترغيب والترهيب ১/ ৩৩৩: إسناده حسن، وأشار إلى ثبوته الهيثمي في مجمع الزوائد، ২/ ২৫৩

হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা কিয়ামুল লাইল- রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় ও বিভিন্ন বন্দেগীর মধ্যে, আর তাঁর সম্মান মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যে। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯২১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৪২৭৮

৬.ফরয নামাযের পরেই যার স্থান:

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুমিনের পরিচয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর পরই যে নামায আল্লাহর কাছে প্রিয় তা হল তাহাজ্জুদ। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ.

"রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ।"

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫

৭.জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির আমল:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, মানুষের সাথে আমিও তাঁকে একনজর দেখবার জন্য বের হলাম। তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে যখন তাকালাম, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, এ কোনো মিথ্যাবাদির চেহারা হতে পারে না। তখন তাঁর মুখে সর্বপ্রথম আমি যে কথাগুলো শুনেছি-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

হে লোকসকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার করাও! আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন তুমি নামায আদায় কর! তবেই নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। -জামে তিরমিযি, হাদীস ২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৫১।

অন্য হাদীসে পাওয়া যায়, উপরোক্ত গুণাবলী যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, জান্নাতে থাকবে তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদা। হযরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ فِي الْجَنّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّى وَالنّاسُ نِيَامٌ.

'নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে এমন কিছু কক্ষ/প্রাসাদ, যার বাহির থেকে ভেতরাংশ দেখা যাবে, ভেতর থেকে বহিরাংশ দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, কোমল ভাষায় কথা বলে, ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তারা নামাযে দণ্ডায়মান থাকে।"
-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৯; জামে তিরমিযি, হাদীস ২৫২৭

৯. *পাপ মোচন করে:*

তাহাজ্জুদ গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فَإِنّهُ دَأْبُ الصّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسّيّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

"তোমরা কিয়ামুল লাইলের প্রতি যত্নবান হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস এবং রবের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। আর তা পাপরাশী মোচনকারী এবং গোনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী।"
-(জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬)

১০. দোয়া কবুলের সর্বোত্তম সময়:
তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তাআলা বান্দার দোয়া কবুল করেন।

১১.গুনাহ মাফের সুযোগ:

নবী ﷺ বলেন, *"রাতের নামাজ গুনাহ মাফের কারণ।"*
(তিরমিযি)

১২. দিলের প্রশান্তি ও নূর:

তাহাজ্জুদ নামাজ মনকে শান্ত করে, হৃদয়ে নূর ও প্রশান্তি আনে।

১৩. বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা:

তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা আল্লাহর বিশেষ বন্ধু এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

১৪.গভীর রাতে ইবাদত:

গভীর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন জেগে আল্লাহর ইবাদত করা এর বিশেষত্ব, যা সওয়াব ও বরকত বাড়িয়ে দেয়।

১৫.কুপ্রবৃত্তি দমন:

তাহাজ্জুদ নামাজ কুপ্রবৃত্তি দমনে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভে সাহায্য করে।

- *রাসূল (সা.)এর তাহাজ্জুদ* :

যে আমল নবীজী কখনও ছাড়েননি তা হলো তাহাজ্জুদ। প্রিয় জিনিস কি কেউ কখনও ছাড়তে চায়? আর যদি সাথে যুক্ত হয় মজবুত ঈমান ও সওয়াবের আশা, হৃদয়ে থাকে প্রভুর প্রতি ভালবাসা এবং আমলের অদম্য প্রেরণা; তখন কঠিন কাজও হয়ে যায় অতি সহজ। হাঁ, আমাদের জন্য এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
উরওয়া রাহ. বলেন, আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، حَتّى تَتَفَطّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.

"(নবীজী সা.) রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর পাও মোবারক ফুলে যেতো। এ দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কি উচিত নয় যে, (এই মহা অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে) আমি একজন পূর্ণ শোকর আদায়কারী বান্দা হব?"

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২০

স্বেচ্ছায় তো ছাড়তেনই না, কখনো অনিচ্ছায় ছুটে গেলেও কাযা করে নিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত, রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় বারো রাকাত আদায় করে নিতেন।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬

অন্য বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রা.-কে হযরত আয়েশা রা. বললেন-

ياعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللّيْلِ، فَإنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّى قَاعِدًا.

"হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন।"

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯

হযরত আলী রা. বলেন-

إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ فَتَسَوّكَ ثُمّ تَوَضّأَ ثُمّ قَامَ إِلَى الصّلَاةِ جَاءَهُ الْمَلَكُ حَتّى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ فَلَا يَزَالُ يَدْنُو مِنْهُ حَتّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلّا دَخَلَتْ جَوْفَه.ُ

"কেউ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠে এবং মিসওয়াক করে ওযু করে, অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশতা তিলাওয়াত শোনার জন্য পিছনে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ফিরিশতা তার নিকটবর্তী হতে থাকে; একপর্যায়ে খুব নিকটে চলে আসে এবং ব্যক্তির মুখে মুখ রেখে দেয়। তখন সে যা তিলাওয়াত করে ফিরিশতার উদরে চলে যায়।"

-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ১৮১০; ফাযলু কিয়ামিল লাইল, আজুররী, হাদীস ৩৫।

- তাহাজ্জুদ নামাজের কিছু আদব:

অন্য সকল আমলের মতো এই ফযীলতপূর্ণ আমলটির ক্ষেত্রেও কিছু আদব ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। যেমন-

১.*চোখ মোছা ও দোয়া করা:*

ইবনে আব্বাস রা. নবীজীর রাতের আমল প্রত্যক্ষ করার জন্য তার খালা উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রা.-এর ঘরে ছিলেন। তিনি বলেন, দেখলাম-

...اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে দুই হাত দিয়ে চোখ মুছে ঘুম দূর করলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।"
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬৩

২.*মিসওয়াক করা:*

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন ভালো করে মিসওয়াক করতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫১৬

হযরত আলী রা. বলেন-

إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ فَتَسَوّكَ ثُمّ تَوَضّأَ ثُمّ قَامَ إِلَى الصّلَاةِ جَاءَهُ الْمَلَكُ حَتّى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ فَلَا يَزَالُ يَدْنُو مِنْهُ حَتّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلّا دَخَلَتْ جَوْفَه.

"কেউ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠে এবং মিসওয়াক করে ওযু করে, অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশতা তিলাওয়াত শোনার জন্য পিছনে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ফিরিশতা তার নিকটবর্তী হতে থাকে; একপর্যায়ে খুব নিকটে চলে আসে এবং ব্যক্তির মুখে মুখ রেখে দেয়। তখন সে যা তিলাওয়াত করে ফিরিশতার উদরে চলে যায়।"
-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ১৮১০; ফাযলু কিয়ামিল লাইল, আজুররী, হাদীস ৩৫।

৩.প্রথমে হালকা দুই রাকাত দিয়ে শুরু করা:

প্রথমে ছোট সূরা দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই রাকাত আদায় করবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন।
আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন-

افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

শুরুতে হালকা করে দুই রাকাত আদায় করতেন।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৫৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৬৬৮২।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

"তোমাদের কেউ যখন রাতে উঠবে, সে যেন প্রথমে হালকা দুই রাকাতের মাধ্যমে শুরু করে।"
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩২৩।

৪.*নিয়মিত আদায় করা:*

আমরা চেষ্টা করব তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করতে। একান্ত ওজর ছাড়া তাহাজ্জুদ ছাড়ব না। নবীজী নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। যেকোনো আমল নিয়মিত আদায় করা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়। হাদীসে এসেছে-

أَحَبّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل.

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।"
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪২।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.- কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলছেন-

يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

“হে আব্দুল্লাহ! অমুকের মতো হয়ো না। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করত; কিন্তু পরবর্তীতে আবার ছেড়ে দিল।”
-সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০৩

৫.রাত্রি জাগরণে ভারসাম্য রক্ষা:

অনেক সময় এমন হয় সারা রাত জেগে নামায পড়া হল, কিন্তু ভোর রাতে একটু বিশ্রাম করতে গিয়ে ফজরের জামাতই ছুটে গেল। অথচ ফজরের জামাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। হাদীসের কিতাবে একটি ঘটনা পাওয়া যায়-
উমর ইবনে খাত্তাব রা. একদিন ফজরের সালাতে সুলায়মান ইবনে হাসমা রা.-কে পাননি। সকালে উমর রা. বাজারে গেলেন। সুলায়মান রা.-এর বাড়ি হল বাজার আর মসজিদে নববীর মাঝখানে। তাই সুলায়মান রা.-এর মা শিফা রা.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উমর রা. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সুলায়মানকে ফজরে দেখলাম না। তিনি বললেন, সে রাতে সালাত আদায় করেছে। একপর্যায়ে তার ঘুম চলে এসেছে। উমর রা. বললেন-

لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة.

“ফজরের জামাতে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট সারারাত সালাত আদায় করার চাইতে বেশি প্রিয়।”
-মুয়াত্তা মালিক, হাদীস ৭

৬.ঘুমের চাপ হলে বিশ্রামে চলে যাওয়া:

অনেকসময় এমন হয় যে, ঘুমের চাপ এত বেশি থাকে যে, আমল করাই কঠিন হয়ে যায়। নামাযে কী পড়ছে, কয় রাকাত
পড়ল কিছুই বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় নামায জারি না রেখে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেওয়া চাই।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّى يَذْهَبَ عَنْهُ النّوْمُ، فَإِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبّ نَفْسَه.ُ

“যদি (রাতের) নামাযে কারো তন্দ্রা আসে সে যেন শুয়ে যায়, যতক্ষণ না তার ঘুম দূর হয়। কেননা এ অবস্থায় (সে কী বলে কিছুই বুঝতে পারে না;) হয়ত সে ইস্তেগফার করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসতে পারে।”

-সহীহ বুখারী, হাদীস ২১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৮৫।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ.

"যখন কেউ রাতে নামাযে দাঁড়াল, কিন্তু (ঘুমের কারণে) তার মুখে উচ্চারিত কুরআন এত অস্পষ্ট শোনা যেতে লাগল যে কী বলছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, সে যেন শুয়ে পড়ে!"
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৮৭

৭.*সপরিবারে তাহাজ্জুদ:*

এত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতের আমল একা কেন, পরিবারের অন্যান্যদেরও অংশগ্রহণ করাতে পারি এবং অনায়াসেই শামিল হতে পারি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানের নূরানী দুআয়। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّى، ثُمّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّتْ، ثُمّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

"সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে, তারপর স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও সালাত আদায় করে। স্ত্রী যদি উঠতে না চায় তখন তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে হলেও উঠানোর চেষ্টা করে। তদ্রুপ ওই নারীর প্রতি আল্লাহ রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে তারপর স্বামীকে জাগিয়ে দেয় এবং স্বামী উঠে সালাত আদায় করে। স্বামী উঠতে না চাইলে চেহারায় পানি ছিটিয়ে হলেও তাকে উঠানোর চেষ্টা করে।"
-সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৩০২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৬।

আরেক হাদীসে এসেছে, স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরকে জাগিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে যাকিরীনের মধ্যে গণ্য করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

“যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য রাতে ওঠে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়; অতঃপর দুজনে একসাথে দুই রাকাত নামায আদায় করে তাদেরকে যাকিরীনের মধ্যে গণ্য করা হয়, যারা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৫।

৮.*নিয়ত করা:*

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-
مَنْ أتى فِراشَه وَهُوَ يَنْوي أن يّقُومَ يُصلِّي مِنَ اللّيلِ فغلبتْهُ عَيْناه حَتّى أصْبحَ، كُتبَ لَه مَا نَوى، وَكانَ نومُهُ صدَقةً عَلَيْهِ مِنْ رّبِّه - عز وجل

“যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ার নিয়ত করে বিছানায় গেল, কিন্তু ঘুম তাকে পরাস্ত করল, সে উঠতে পারল না, সকাল হয়ে গেল, তাহলে নিয়তের কারণে তার আমলনামায় আমলের সওয়াব লেখা হবে। আর এই ঘুম রবের পক্ষ থেকে তার জন্য সদাকা বলে বিবেচিত হবে।” -সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১৭৮৭।

৯.*অতি আরামদায়ক বিছানা* :

শেষ রাতে ওঠার প্রতিবন্ধকতা দূর করি। বিছানা অতি আরামদায়ক হলেও শেষ রাতে উঠতে কষ্ট হয়ে যায়। কারণ বিছানা যত আরামদায়ক হবে ঘুম তত গভীর হবে। ফলে শেষ রাতে ওঠা কষ্টকর হয়। নবীজীর ঘটনা- উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা. একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দু-পাট্টার বিছানাকে চার পাট্টা করে দিয়েছেন, যেন একটু আরাম হয়। সকালে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে কী বিছিয়েছিলে? বললেন, আগের বিছানাই তো ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেবল দু-পাট্টাকে চার পাট্টা করে দিয়েছিলাম। নবীজী তখন বললেন-

رُدّوْهُ لِحالَتِهِ الأوْلى فإنّه مَنَعَتْنِي وَطاءَتُه صَلاتِيَ اللّيْلَةَ.

“আগের মতো করে দিও! কারণ এর কোমলতা আমাকে রাতে নামায থেকে বিরত রেখেছে।”
-শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস:৩৩০

১০.*গভীর রাতে প্রভুর সান্নিধ্যে:*

গভীর রাত। সবাই এখন আরামের নিদ্রায়। আমি আরামের নিদ্রা ত্যাগ করেছি কেবল আপন রবের সান্নিধ্য লাভের জন্য। হাঁ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এসময় স্বয়ং আল্লাহ বান্দার নিকটবর্তী হয়ে যান। এমন সময় যদি আমিও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করি তাহলে খুব সহজেই লাভ হবে রবের সান্নিধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السّاعَةِ فَكُن.ْ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه.ِ

“রাতের শেষভাগে রব তাঁর বান্দার খুব নিকটবর্তী হন। যদি পার, ওই সময় আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও!”

-জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১২৭৭

রাতের শেষ প্রহর : রব তোমাকে ডাকছেন!

আল্লাহ যেন আমার ডাকে সাড়া দেন। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন- এর জন্য আমাদের কত ভাবনা! কোন্ আমল করলে আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কখন কীভাবে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন- কত ভাবনা। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয়- স্বয়ং আল্লাহ বান্দাকে ডাকতে থাকেন দুআ কবুলের জন্য, আল্লাহ ডাকতে থাকেন বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য! হাঁ, রাতের শেষ প্রহর! এটিই সময় দুআ কবুলের, এটিই সময় রবের ক্ষমা লাভের। কারণ এসময় রাব্বুনা তাবারাকা ওয়া তাআলা বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য, তাকে ক্ষমা করার জন্য ডাকতে থাকেন। নবীজী সা. বলেন-

يَنْزِلُ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه.ُ

“আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছো, দুআ করবে আমি তার দুআ কবুল করব। কে আছো, আমার কাছে (তার প্রয়োজন) চাইবে আমি তাকে দান করব। কে আছো, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব।”

-সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮।

এর জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল, তাহাজ্জুদ। তাই আসুন, তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হই। নিজে অভ্যস্ত হই। অন্যকেও উৎসাহিত করি এবং সহযোগিতা করি।

★কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) ও খুসুফ (চন্দ্রগহণ) এর নামাজ

কুসুফ অর্থ সূর্যগ্রহন ।

কুসুফ হলো সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

খুসুফ অর্থ চন্দ্রগ্রহন।

খুসুফ হলো চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

- *কুসুফ ও খুসুফের হিকমত*

এ দুটি আল্লাহ তাআলার নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান, যাতে তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ কারও মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে আলোহীন হয় না। এ দুটো বরং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এ দুটোয় গ্রহণ লাগে তোমরা তখন নামাজের দিকে দ্রুত আগাও।"
(আবু দাউদ:১/১৯৩)

- *কুসুফ ও খুসুফের নামাজের হুকুম*

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"নিশ্চয় চাঁদ ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে এ দুটোয় গ্রহন লাগে না। অতএব তোমরা যখন তা দেখবে আল্লাহকে ডাকো, তাকবীর দাও, নামাজ পড়ো ও সদকা করো।"

(বুখারী ও মুসলিম)

- *কুসুফ ও খুসুফের নামাজের সময়*

কুসুফ ও খুসুফ শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত মুসল্লী তার নামাজ পূর্ণ করে নেবে যদিও কুসুফ ও খুসুফ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর যদি নামাজ পড়ে শেষ করা হয়, কিন্তু কুসুফ ও খুসুফ বলবৎ থাকে তাহলে আবার নামাজ আদায়ের প্রয়োজন নেই। বরং দুআ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকলেই চলবে।

- *কুসুফ ও খুসুফের নামাজের আদায় পদ্ধতি*

আয়েশা রাযি. বলেন, *"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লাগল। তখন তিনি লোকজন নিয়ে নামাজ পড়লেন। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর তিনি রুকু করলেন ও রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। এটা রুকুর পূর্বের কিয়ামের অতিরিক্ত। তারপর আবার রুকু করলেন এবং রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এটা প্রথম রুকুর অতিরিক্ত। তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং সিজদায় দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতেও প্রথম রাকাতের মতোই করলেন। অতঃপর গ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি নামাজ বন্ধ করলেন। এরপর তিনি মানুষের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন।কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন তা দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর দেবে, নামাজ। পড়বে এবং সদকা করবে।"*(বর্ণনায় বুখারী)

অতএব যদি চাঁদ অথবা সূর্য গ্রহণ লাগে, তা হলে **"আস্সালাতু জামেয়া"** অর্থাৎ একত্রে নামাজ আদায় হবে বলে নামাজের জন্য ডাক দিতে হবে। মানুষ যখন জমায়েত হবে তখন ইমাম তাদের নিয়ে দীর্ঘ দু রাকাত নামাজ পড়বে। প্রকাশ্য আওয়াজে কিরাত পড়বে।
প্রথম রাকাতে পড়বে সূরা ফাতিহা এবং পর একটি দীর্ঘ সূরা। এরপর রুকু দেবে ও দীর্ঘ সময় রুকুতে থাকবে। এরপর سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد বলে মাথা উঠাবে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়ে অপর একটি দীর্ঘ সূরা তার সঙ্গে মিলাবে, যা হবে প্রথমটির চেয়ে ছোট। এরপর রুকু দেবে এবং রুকুতে গিয়ে দীর্ঘ সময় থাকবে, তবে প্রথমটির চেয়ে একটু কম সময় থাকবে। এরপর দীর্ঘ দুই সিজদা করবে। এ দুই সিজদার মাঝখানে বসবে। তবে বৈঠক দীর্ঘ করবে না।

এরপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত, কিয়াম ও রুকু সিজদায়, প্রথম রাকাতের মতোই আদায় করবে। তবে সবকিছুই পরিমাণে প্রথম রাকাতের চেয়ে কম হবে। এরপর বসবে ও তাশাহ্হুদ পড়বে ও সালাম ফিরাবে।
আহলে ইলমের কেউ কেউ প্রতি রাকাআতে এক রুকু করার কথা বলেছেন।

- কুসুফ ও খুসুফ নামাজের সুন্নাতসমূহ:

১. কুসুফ ও খুসুফের নামাজ জামাআতের সহিত পড়া হবে। কিন্তু যদি কেউ একাকী পড়তে চায় তবে তাও শুদ্ধ হবে।

২. এ নামাজদ্বয় মসজিদে আদায় করতে হবে। আর নারীরাও এতে অংশ নিতে পারবে।

৩. কিয়াম, রুকু ও সিজদা সবকিছুই দীর্ঘায়িত করে নামাজ পড়বে। তবে যদি গ্রহণ চলে যায় তা হলে দ্রুত শেষ করে দেবে।

৪. নামাজের পর ওয়াজ-নসীহত করবে। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার কথা মানুষকে স্মরণ করাবে। কুসুফের হিকমত বর্ণনা করবে। ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি মানুষদেরকে উৎসাহ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানাবে।

৫. বেশি বেশি দুআ, মিনতি, ইস্তিগফার ও দান-খয়রাত ও অন্যান্য ভালো কাজ করবে, যাতে আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর থেকে বালা-মুসিবত উঠিয়ে নেন।

৬. কুসুফের ক্ষেত্রে দুআ করার সময় হাত উঠানো বৈধ। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. বর্ণনা করে বলেন, "অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। আর তিনি ছিলেন নামাজে দাঁড়িয়ে দু হাত উত্তোলন করে দুআ রত।"

- *দিকনির্দেশনাঃ*

১. কুসুফ ও খুসুফ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি এ ব্যাপারে জানা না যায়, তবে আর নামাজ আদায়ের প্রয়োজন নেই।

২. আধুনিক বিজ্ঞান যদিও কুসুফ ও খুসুফ সংঘটিত হওয়ার কারণ আবিষ্কার করতে পেরেছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে কুসুফ ও খুসুফ আল্লাহর নিদর্শন নয় যা দিয়ে তিনি বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতএব সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে মুসলমানের উচিত ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতিতে ব্যস্ত হওয়া। টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহণ প্রক্রিয়া দেখার জন্য মেতে উঠা সমীচীন নয়।

৩. যে ব্যক্তি কুসুফের নামাজের প্রথম রাকাতের প্রথম রুকু ধরতে পারল সে রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রুকুতে ইমামকে পেল সে রাকাত পায়নি বলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় ইমামে সালামের পর প্রথম রাকাত নিয়ম অনুযায়ী কাযা করে নিতে হবে।

৪. নিষিদ্ধ সময়েও কুসুফের নামাজ আদায় করা শুদ্ধ হবে।

৫. অন্য কারও খবরের ওপর ভিত্তি করে কুসুফ ও খুসুফের নামাজে রত হওয়া শরীয়তসিদ্ধ নয়। বরং নিজেদেরকে স্বচক্ষে তা দেখে নিতে হবে।

★ ইস্তিখারার নামাজ

ইস্তিখারা অর্থ খইর বা কল্যাণ প্রার্থনা করা। *সালাতুল ইস্তিখারা* (*صلاة الاستجارة*) *মুসলিমদের* একটি প্রার্থনা যার সাহায্যে তারা তাদের জীবনের নানা সমস্যার কল্যাণকর সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হওয়ার সময় আল্লাহ থেকে নির্দেশনা চান।
ইস্তেখারা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন জিনিসের ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করা অর্থাৎ আপনার যদি কোন কাজ করার ইচ্ছা হয় কাজটি আপনার জন্য কল্যাণকর নাকি বিপদজনক এ বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে পরামর্শ তলব করা। সালাতুল ইস্তেখারা হলো আল্লাহর নিকট কোন জিনিসের ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করা। কোন কিছু নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা থাকলে এই নামাজ পড়া হয়। এই নামাজ খুব নিয়ামতপুর্ণ । আরবীতে সালাহ নামে পরিচিত নামাযটি নামাজের দুটি একক বা রাকাত এর পরে *সালাত আল-ইস্তিখারা*-এর দোয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়।

প্রাক-ইসলামী আরবে বা জাহেলি যুগে ইসলামে অবৈধ হিসেবে বিবেচিত প্রচলিত পাখি উড়িয়ে শুভ- অশুভের সিদ্ধান্ত নেওয়া ও ভাগ্য গণণাকারী তীর এর একটি অনুমোদিত ইসলামী বিকল্প হিসাবে অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক বিরাট দান- ইস্তিখারা।
কমযোর বান্দা দুনিয়ার জীবনে কত কিছুর মুখাপেক্ষী। তার কত প্রয়োজন, কত দায়িত্ব। এই সব বিষয়ে সে আসমানী শান্তনার ছায়া পেতে পারে ইস্তিখারার মাধ্যমে। আল্লাহর ফয়সালার প্রতীক্ষা, আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে সমর্পণ এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার অপূর্ব এক অনুশীলন এই ইস্তিখারা।
এরচেয়েও বড় কথা হল, ইস্তিখারার মাধ্যমে বান্দা যেন সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। নিজের ভবিষ্যত ও ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, দ্বিধাগ্রস্ত, দোদুল্যমান এক বান্দার জন্য এ কত বড় প্রাপ্তি!
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইস্তিখারার আমল শিক্ষা দিয়েছেন।

সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন-
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السّورَةَ مِنَ القُرْآنِ.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের সূরা যেভাবে শেখাতেন, সকল বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে) সেভাবে ইস্তিখারা করতে শিখিয়েছেন।’
-সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৬৬

অর্থাৎ কুরআনের আয়াত যেভাবে মুখস্থ করিয়েছেন সেভাবেই ইস্তিখারার আমল শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইস্তিখারার দুআ মুখস্থ করিয়েছেন।

দ্বীন-দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কাজ এবং যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কর্তব্য হল- প্রথমে আল্লাহ প্রদত্ত আকল ও বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করা। সেই কাজ ও সিদ্ধান্তের নানা দিক বিবেচনা করে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং উপকারী-অপকারী বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা।
এরপর দুই রাকাত নামায পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দুআর মাধ্যমে ইস্তিখারা করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা।
এর সঙ্গে সঙ্গে আপনজন, ঘনিষ্ঠজন, হিতাকাঙ্ক্ষী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মশওয়ারা বা পরামর্শ করা। ইসলামী শরীয়তে মশওয়ারার গুরুত্বও অনেক। কুরআনুল কারীমে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে-

وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

‘অর্থাৎ (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) আপনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মাশওয়ারা করুন।’
-সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৯

অন্য এক আয়াত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.ۡ

‘অর্থাৎ তাঁদের বিষয়াবলী পারস্পরিক মশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়।’
-সূরা শূরা (৪২) : ৩৮

- *ইস্তিখারা নামাজের হুকুম*

ওলামায়ে কেরাম একমত যে, ইস্তিখারার নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তার দলীল নিম্নের বুখারীর হাদীস-

عَنْ جَابِرٍ وعن سعد بن ابي وقاص صحيح البخري, **أن النبي قال:من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة بني آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله.**صحيح حديح ,

জাবিরের সূত্রে এবং সহীহ আল-বুখারিতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সূত্রে, নবী (সা) বলেছেন: “ আদম সন্তানের সুখের একটি অংশ আল্লাহর পরামর্শ চাওয়া, আদম সন্তানের সুখের একটি অংশ হল আল্লাহ তাকে যা আদেশ করেছেন তাতে সন্তুষ্টি। আদম সন্তানের দুঃখের একটি অংশ হল আল্লাহর পরামর্শ চাইতে তার অবহেলা, এবং আদম সন্তানের দুঃখের একটি অংশ হল আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার প্রতি তার অসন্তুষ্টি।”
(সহীহ হাদীস)

দোয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ

“হে আল্লাহ, যদি তুমি এর মধ্যে কল্যাণ জানো, তাহলে তা সম্পন্ন করো।”

আহমাদ ইবন মানী (রহঃ) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ *নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে হুসায়ন!*

আজকাল কয়জন মা'বুদের পূজা কর? আমার পিতা বললেনঃ সাত জনের; ছয়জন যমীনের, একজন আসমানের।
তিনি বললেনঃ তোমার আশা ও ভয়ের সময় কাকে তুমি গন্য মনে কর? আমার পিতা বললেনঃ যিনি আসমানে আছেন তাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে হুসায়ন! শোন তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তোমাকে আমি এমন দুটি কালিমা শিখিয়ে দেব যা তোমার উপকারে আসবে।
ইমরান (রহঃ) বলেনঃ (আমার পিতা) হুসায়ন যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে সেই দুটো কালিমা শিখিয়ে দিন, যে দুটোর ওয়াদা আপনি আমার সঙ্গে করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি দু'আ করবেঃ

)اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي(
হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দিন আর আমাকে পানাহ দিন আমার নফসের অনিষ্ট থেকে। ছানী ২৪৭৬
হাদীসটি হাসান-গারীব। ইমরান ইবন হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (রহঃ) ..... আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেনঃ
(اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي –)
হে আল্লাহ! আমার কাজ কল্যাণমূলক করুন এবং কল্যাণমূলক কাজ আমার জন্য নির্ধারণ করুন।
— তিরমিযী ৩৫১৬, যঈফ, যঈফা ১৫১৫, হাদীসটি গরীব।

- *ইস্তিখারার পদ্ধতি ও দুআ:*

সহীহ বুখারীসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবে হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, *"তোমাদের কেউ যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করবে প্রথমে দুই রাকাত নামায পড়বে। এরপর বলবে-*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ

أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের ওসিলায় আপনার কাছে (আমার উদ্দিষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওসিলায় আপনার কাছে (কল্যাণ অর্জনের) শক্তি চাই, আর আপনার কাছে চাই আপনার মহা অনুগ্রহের কিছু। কেননা, (সকল বিষয়ে) আপনার ক্ষমতা রয়েছে, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি (সবকিছু) জানেন, আমি কিছুই জানি না। আপনি তো আল্লামুল গুয়ূব-গায়েবের সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। (অর্থাৎ আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি আমার জন্য কল্যাণকর কি না- তা আপনিই জানেন, আমি জানি না।) হে আল্লাহ! আমার দ্বীন, আমার জীবন-জীবিকা ও কাজের পরিণামের বিচারে যদি এ বিষয়টি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন, তাহলে আমার ভাগ্যে তা নির্ধারণ করে দিন এবং বিষয়টিকে আমার জন্য সহজ করে দিন। এরপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন।
আর যদি বিষয়টি আমার দ্বীন, আমার জীবন-জীবিকা ও কাজের পরিণাম বিচারে আমার জন্য ক্ষতিকর বলে জানেন, তাহলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করুন; তা যেখানেই হোক। অতপর তাতেই যেন আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাই সেই তাওফীক দান করুন।
তিনি ইরশাদ করেন, দুআটির যে দুই জায়গায় هَذَا الأَمْر শব্দ আছে, সেখানে নিজ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। (কিংবা অন্তত মনে মনে কল্পনা করবে।)"
-সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৮০ ; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৮।

অনেকের ধারণা-ইস্তিখারা করার সময় হল রাতে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে। ধারণাটি ঠিক নয়। ইস্তিখারা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই বরং যখন প্রয়োজন হবে তখনই ইস্তিখারা করবে। তাতে রাত-দিন বা ঘুমানো-জাগ্রত থাকার কোনো বিষয় নেই।

কারো করো ধারণা, ইস্তিখারা করার পর বিশেষ একটি স্বপ্ন দেখা যায়। সেখানে কাজটির ভালো-মন্দ সম্পর্কে নির্দেশনা থাকে। কিংবা কাজটি করা না করার বিষয়ে কোনো আদেশ-নিষেধ থাকে। এমন ধারণাও ভিত্তিহীন। ইস্তিখারার সঙ্গে এমন কোনো স্বপ্ন বা ইঙ্গিত-ইশারার আবশ্যকীয়তা নেই। তবে কখনো এমন কোনো স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে, কিংবা কেউ কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পেতে পারে, সেটা ইস্তিখারার অনিবার্য বিষয় নয়। তাই এমন স্বপ্ন-ইশারার অপেক্ষা করবে না।

কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন, ইস্তিখারা করলে সম্ভাব্য বিষয়গুলোর কোনো একটির দিকে দিলের ঝোঁক সৃষ্টি হয়। তবে যদি কোনো দিকে ঝোঁক নাও হয় এবং কোন কাজটি করবে সে ব্যাপারে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বও থেকে যায় তবু ইস্তিখারার মাকসাদ পূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ, ইসতিখারা করার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে দিয়ে সেই কাজই করিয়ে নেন, যা বান্দার জন্য কল্যাণকর।

ইস্তিখারার পর সেই কাজেরই প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি তৈরি হয়, যাতে বান্দার জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে। বান্দা তখন নিজের অজান্তেই সেই কাজের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।
আবার কখনো বান্দা কোনো বিষয়কে কল্যাণকর মনে করে সেটি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ কোনোভাবে সেই কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে সেই কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তা থেকে বিরত রাখেন। অতএব ইস্তিখারা করার পর বান্দা ধীরে ধীরে কাজের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাকে কল্যাণকর বিষয়ের দিকেই নিয়ে যাবেন- এই বিশ্বাস রেখে কাজ করবে।
এক্ষেত্রে হযরত ইবনে উমর রা.-এর বিখ্যাত বাণীটিও মনে রাখবে, তিনি বলেছেন-
إِنّ الرّجُلَ يَسْتَخِير اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَخْتَارُ لَهُ، فَيَسْخَطُ عَلَى رَبِّهِ عَزّ وَجَلّ، فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعَاقِبَةِ، فَإِذَا هُوَ خَيْرٌ لَه.ُ

‘অনেক সময় মানুষ ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেই বিষয়টিই নির্বাচন করেন, যাতে তার কল্যাণ নিহিত। কিন্তু (বাহ্যিক দৃষ্টিতে বান্দার কাছে তা কল্যাণকর মনে না হওয়ায়) সে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এরপর যখন বিষয়টির সুন্দর পরিণাম দেখতে পায় তখন বুঝতে পারে, সেই ফায়সালা কত কল্যাণময় ছিল।’
-কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক, পৃষ্ঠা ৩৩, রেওয়ায়েত ১২৮।

অর্থাৎ ইস্তিখারার পর আল্লাহ তাআলা যে কাজের দিকে বান্দাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন বান্দা যেন সেটিকেই তার জন্য কল্যাণকর মনে করে। কারণ বান্দা যখন ইস্তিখারা করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে কল্যাণের দিকেই নিয়ে যান। এক্ষেত্রে বান্দা বিষয়টি না বোঝার কারণে কিংবা প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে কখনো মনে কষ্ট পায়। ভাবে, আল্লাহর কাছে আমি কল্যাণ প্রার্থনা করলাম কিন্তু আল্লাহ আমার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করলেন না (আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা থেকে আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন)।

অবশ্য পরে যখন প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বান্দা নিজেই তার কল্যাণ দেখতে পায় তখন ভুল ভাঙ্গে। তাতে আল্লাহর প্রতি সমর্পণের বরকত থেকে সে বঞ্চিত হয় এবং তাঁর প্রতি

মন্দ ধারণার গোনাহে লিপ্ত হয়। কখনো তো এমনও হয় যে, আল্লাহর ফায়সালার কল্যাণকরতা দুনিয়াতে প্রকাশ পায় না। আখিরাতে প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে বান্দা কেবলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভুল শোধরানোর এবং তাওবা ইস্তিগফারের সুযোগও পায় না। তাই ইস্তিখারার হাকীকত ও গুরুত্ব জেনে আমল করলে বান্দা অনেক স্বস্তি ও আনন্দের সাথে কামিয়াবী অর্জন করতে পারে।

- *সংক্ষিপ্ত ইস্তিখারা:*

ইস্তিখারার যে সুন্নত পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হল সেটি তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন এই নিয়মে ইস্তিখারা করার সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইস্তিখারার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে ইস্তিখারার মাসনূন দুআটি পড়া যায়। কিন্তু অনেক সময় তো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিংবা দুই রাকাত নামায পড়ে উক্ত দুআটি পাঠ করার মতো সময় ও সুযোগ পাওয়া যায় না। তখনকার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত দুআ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। দুআটি হল-

اللّٰهُمّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي.

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. তাঁর বাবা হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতেন এই দুআ পড়তেন। দুআটির অর্থ হল, *হে আল্লাহ! আমাকে কল্যাণ দান করুন এবং আমার জন্য আপনিই নির্বাচন করে দিন* (কোন্ বিষয়টি আমার অবলম্বন করা উচিত)। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫১৬

এক্ষেত্রে পড়ার মতো আরেকটি দুআ হল-

اللهُمّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي.

“হে আল্লাহ! আমাকে পথ প্রদর্শন করুন এবং সঠিক পথে অবিচল রাখুন।”
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫

এমন আরেকটি মাসনূন দুআ-

اللّٰهُمّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সঠিক পথের ‘ইলহাম’ করুন এবং নফসের মন্দত্ব থেকে আমাকে রক্ষা করুন।”

-জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৮৩।

এই দুআগুলোর মধ্য থেকে যেটি মনে আসবে পড়ে নিবে। এমনকি যদি আরবী দুআ মুখস্থ না থাকে কিংবা মনে না আসে তাহলে নিজের ভাষায় আল্লাহকে বলবে, হে আল্লাহ! আমি দ্বিধান্বিত। আমাকে সঠিক পথ অবলম্বন করার এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তাওফীক দিন। যদি মুখে বলা সম্ভব না হয় তাহলে মনে মনেই আল্লাহর কাছে আবেদন করবে, হে আল্লাহ! আমি এই সমস্যার সম্মুখীন। আমাকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার তাওফীক দিন। যে পথে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত এবং যে পথ ধরে অগ্রসর হলে আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব সে পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন।

- *ইসতিখারা কতবার করবে?*

একই বিষয়ের জন্য ইস্তিখারা একাধিকবার করার কথা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় নাই। তাই সাধারণ নিয়ম হল, ইস্তিখারা একবার করা। তবে যেহেতু বারবার দুআ করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর ইস্তিখারা তো দুআরই একটি প্রকার। সেজন্য ইস্তিখারার নামায ও দুআ বারবার করা যায়।

- *ইসতিখারা সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়:*

১. ইস্তিখারার নামাযে যে কোনো সূরা বা কুরআন মাজীদের যে কোনো জায়গা থেকে তিলাওয়াত করা যায়। উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়ার পরামর্শ দেন। কেউ কেউ পরামর্শ দেন প্রথম রাকাতে সূরা কাসাসের ৬৮ নম্বর আয়াত-

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

পড়তে, আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আহযাবের ৩৬ নম্বর আয়াত-

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

পড়তে। কিন্তু এজাতীয় কোনো কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব কুরআন মাজীদের যে কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে পারে, উপরোক্ত সূরা বা আয়াত পড়তেও কোনো সমস্যা নেই।

২. যদি সময় ও সুযোগ থাকে এবং বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে একাধিকবার আমল করা যেতে পারে।

৩. ইস্তিখারা ও মশওয়ারার পর স্বপ্ন দেখার বিষয়টি আবশ্যকীয় নয়। তাছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুবই জটিল একটি শাস্ত্র। কখনো বিভিন্ন কারণে একই স্বপ্নের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়, সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা যথেষ্ট মুশকিল হয়। উপরন্তু স্বপ্ন তো শরীয়তের কোনো দলীলও নয়।
৪. ইস্তিখারার পর মন যেদিকে ঝুঁকবে সেই দিকটি শরীয়ত ও আকল-বিবেকের বিচারেও উত্তম হওয়া জরুরি। অন্যথায় নফস বা শয়তানের ধোঁকায় মানুষ এমন কোনো দিক অবলম্বন করতে পারে, যা শরীয়ত ও আকল-বিবেকের দৃষ্টিতে উত্তম নয়। কিন্তু প্রবৃত্তির টানে মানুষ সেই দিকে ঝুঁকে যেতে পারে।

৫. একথাও সবসময় মনে রাখা দরকার যে, দুনিয়া ভালো-মন্দ উভয়ের সম্মিলনস্থল। তাই ইস্তিখারার পর যে দিকটি অবলম্বন করা হবে তাতে ইনশাআল্লাহ কল্যাণের অংশই বেশি হবে। বাকি অকল্যাণের কিছু অংশ তাতে থাকা বিচিত্র নয়। অর্থাৎ অধিক কল্যাণের বিবেচনাই এখানে কল্যাণ।

৬. ইস্তিখারার পর যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করা হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হবে। অর্থাৎ ইস্তিখারার পর বান্দার জন্য কল্যাণের পথই উন্মুক্ত হবে। অকল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর এই কল্যাণ ধরে রাখার মেহনতও অব্যাহত রাখতে হবে। নিজের বদ আমল, গাফলত কিংবা অন্য কোনো কারণে যেন সেই কল্যাণ বন্ধ হয়ে না যায়- সেই চেষ্টাও করে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- ইস্তিখারার পর কোনো গাড়ি, বাড়ি বা কোনো জমি সংগ্রহ করা হল, কিংবা কোনো মেয়েকে বিয়ে দেয়া হল, ছেলেকে বিয়ে করানো হল, এখন এসবের হক আদায় করে সেই কল্যাণ বজায় রাখতে হবে। নিজের কোনো বদ আমলের কারণে যদি কোনো ধরনের অকল্যাণ প্রকাশ পায় সেটার জন্য ইস্তিখারাকে দোষারোপ করা যাবে না।

৭. সর্বোপরি আখেরাতের কল্যাণই মুমিনের প্রকৃত কল্যাণ। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে যদি কোনো সমস্যা, সংকট বা পেরেশানী হয় কিন্তু আখেরাতের হিসাবে তা কল্যাণের হয়, তাহলে তো মুমিনের কল্যাণ তাতে আরো বেশি।

সবচেয়ে বড় কথা, ইস্তিখারার মাধ্যমে যেহেতু মুমিন আল্লাহর কাছেই কল্যাণ প্রার্থনা করছে, তো নিশ্চয় আল্লাহ কল্যাণ দান করবেনই। সে দানের মাধ্যম কখনো বুঝে আসে কখনো বুঝে আসে না। তাই তো বাহ্যত অকল্যাণ দেখার পর আল্লাহ নির্ধারিত কল্যাণ যখন মুমিন লাভ করে তখন বলে- 'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।'
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল কাজে ইস্তিখারা করার তাওফীক দান করুন।

- *ইস্তিখারা নামাজের গুরুত্ব:*

নিজের জীবনে, একজন ব্যক্তির অজানা ফলাফল সহ অনেক বিষয়ে উন্মোচিত হয়, এবং সে অজানা পরিণতি সহ বিষয়গুলো গ্রহণ করে, সেগুলো ভাল বা খারাপ কিনা, তার এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কি না। তাই আল্লাহ ইস্তেখারা নামাযকে দ্বিধার চিকিৎসা এবং সমস্যার সমাধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যাতে দ্বিধা স্থিরতা এবং সন্দেহ নিশ্চিততায় পরিণত হয়, ফলে সে আশ্বস্ত ও শান্ত হয়, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হন, যদিও তা মন্দ হয়। কারণ সে তার প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তার উপর ভরসা করেছে।
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শেখাতে আগ্রহী ছিলেন যদি তাদের মধ্যে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা করেন, যদি তিনি তা করার ইচ্ছা করেন বা করার সিদ্ধান্ত নেন তবে তিনি জানেন না। এটা তার জন্য ভালো হোক বা বাস্তবে না হোক, কিন্তু চেহারায় সে এটাকে তার স্বার্থে দেখে।
কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে সমাধান পাওয়া যায় না (মাসলাহাত) এমন ইসলামী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও ইস্তিখারা নির্ধারিত।

সালাতুত তাসবিহ

সালাতুল তাসবীহ (صلاة التسبيح) ইসলামে একটি বিশেষ নফল নামাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। এটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি সালাত, যা নবী করিম ﷺ তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّة."

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বললেনঃ *হে ‘আব্বাস! হে আমার চাচা ! আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপহার দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? আপনি যখন সে কাজগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড় এবং প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। ঐ দশটি মহৎ কাজ হচ্ছেঃ আপনি চার রাক’আত সালাত পড়বেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাআতে যখন কিরাআত পড়া শেষ হবে তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন:*
سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَكْبَر

“সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” ১৫ বার, অতঃপর রুকূ’ করুন এবং রুকূ’ অবস্থায় তা পাঠ করুন ১০ বার, আবার রুকূ’ হতে মাথা উঠিয়ে তা পাঠ করুন ১০ বার, অতঃপর সিজদায় যান এবং সিজদা অবস্থায় তা পাঠ করুন ১০ বার, অতঃপর সিজদাহ হতে মাথা উঠিয়ে তা পাঠ করুন ১০ বার। আবার সিজদা করুন, সেখানে তা পাঠ করুন ১০ বার। অতঃপর সিজদা হতে মাথা তুলে তা পাঠ করুন ১০ বার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাক’আতে তাসবীহর সংখ্যা হবে ৭৫ বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাক’আতে। (এতে পুরো সলাতে তাসবীহর সংখ্যা হবে তিন শত বার)। আপনার পক্ষে সম্ভব হলে উক্ত সলাত দৈনিক একবার আদায় করুন। অন্যথায় সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার, এটাও সম্ভব না হলে বছরে একবার, যদি তাও না হয় তবে সারা জীবনে অন্তত একবার আদায় করুন।”

সুনানে আবু দাউদ,১২৯৭;
সহিহ হাদিস।

দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে তারপর তাশাহহুদ পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবর বলে তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাআত ও চতুর্থ রাকাআতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবে। আর এই সালাতে কোন কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সিজদা এবং মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণণা করা যাবে না, তবে আঙুল চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে।

সালাতুত তাসবিহ নামাজের প্রধান ফজিলত হলো এর মাধ্যমে সমুদ্রে ফেনা পরিমাণ গুনাহও মাফ হয়। এছাড়া, এই নামাজ আমলের পাল্লা ভারী করতেও সাহায্য করে।

সালাতুল হাজত : প্রয়োজন পূরণে নামায

ইসলামের স্বীকৃত আকীদা হল, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুমেই ঘটে। অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে, সর্বত্র, সর্বক্ষণ—একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমই কার্যকর। তাঁর হুকুমের বাইরে এবং তাঁর অগোচরে আসমান ও যমীনের কোথাও কিছু ঘটা সম্ভব নয়। এই আকীদা মুমিন মাত্রই ধারণ করে এবং মনেপ্রাণে লালন করে।
সেজন্যই মুমিন সকল বিষয়ে প্রথমে আল্লাহমুখী হয়। আল্লাহ তাআলার কাছেই নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা জানায়। যাবতীয় চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে। এরপর কায়মনোবাক্যে দুআ করে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার স্বতন্ত্র বিধান—উপায় ও উপকরণ অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হয়।

ছোট বড় যে কোনো প্রয়োজনে মুমিন উপকরণ অবলম্বন করে ঠিকই, তবে কাঙ্খিত বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে ভরসা রাখে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর। বিশ্বাস করে—আল্লাহ তাআলার হুকুম হলেই আমি তা লাভ করব, অন্যথায় নয়। তবে আল্লাহ তাআলাই যেহেতু উপকরণ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই গুরুত্বের সাথে এবং যথাযথভাবে তা অবলম্বন করব।

- *মুমিনের চিন্তা ও কর্মনীতি:*

মুমিন শরীয়তের বিধান মোতাবেক উপকরণ অবলম্বনের সময় এবং তার আগে ও পরে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ-অভিমুখী হয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করে। সেইসাথে বিনীতভাবে দুআ করে এবং বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে দুআ কবুল করানোর চেষ্টা করে। কাঙ্খিত বস্তুটি পাওয়া-না পাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে। সে বিশ্বাস করে—জিনিসটি আমার প্রয়োজন ঠিক, তবে তা আমার জন্য কল্যাণকর না-ও হতে পারে। তাই সে তার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রকৃত কল্যাণও প্রার্থনা করে। এমনকি কাঙ্খিত বস্তুটি পাওয়ার পর তা উত্তম কাজে, উত্তম পন্থায় ব্যবহার করার তাওফীক কামনা করে।

প্রয়োজন দুই ধরনের।
বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের প্রয়োজন প্রথমত দুই ধরনের।

এক. সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়ার মতো বিষয়, যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। যেমন সন্তান লাভ করা, রোগমুক্তি লাভ করা, হায়াতে বরকত হওয়া, রিযিকে বরকত হওয়া ইত্যাদি।

দুই. কোনো মাখলুকের মধ্যস্থতায় পাওয়ার মতো বিষয়। যা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই পাওয়া, তবে ওসিলা হিসেবে সেখানে কোনো মাখলুক থাকে। যেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা লাভ করা, শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি।
জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ উভয় প্রকারের হাজারো প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়। ফলে নিত্যদিন এসব প্রয়োজন পূরণের ক্লান্তিহীন চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে।

প্রথম প্রকারের প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে মানুষ গভীর ধ্যান ও মনোযোগের সাথে আল্লাহ-অভিমুখী হয় ঠিক, তবে দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে উপায়-উপকরণের দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কেউ কেউ তো উপায়-উপকরণের প্রতিই পূর্ণ মনোযোগী হয় এবং এসবের প্রতিই ঝুঁকে থাকে। কিন্তু মুমিন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সবকিছু করার পাশাপাশি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি। তাঁর কাছেই দুআ করে। তাঁর কাছেই সাহায্য চায়।

- *সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম:*

মুমিন তার যাবতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কীভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইবে—সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রসঙ্গ এসেছে নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ. ۘ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

—সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

এখানে মুমিনদেরকে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়—যে কোনো ধরনের, যেকোনো প্রয়োজনে মুমিন ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইবে। এই ব্যাপকতা আয়াতটির মর্মে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (দ্রষ্টব্য : তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৫১; তাফসীরে মাযহারী ১/১৫১; তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ১/৩৯৪)

এখানে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুটি বিষয়। সবর ও সালাত।
সবরের শাব্দিক অর্থ, ধৈর্য। দ্বীন ও শরীয়তে সবরের তিনটি ক্ষেত্রকে মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে।

১. যাবতীয় গোনাহ ও পাপাচার থেকে ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেকে বিরত রাখা।

২. আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেকে অবিচল রাখা।

৩. বিপদাপদ ও বালা-মসিবতের ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করা। অর্থাৎ যাবতীয় বিপদ ও মসিবত আল্লাহ তাআলার হুকুমেই এসে থাকে। এই বিশ্বাস জাগ্রত রাখা এবং এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, ক্ষমা ও প্রতিদান আশা করা।
—আররিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৮৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৫১-৫২

- *সাহায্য চাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম নামায:*

আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল সালাত বা নামায।

উপরে সবর বা ধৈর্যের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বুঝে আসে যে, নামায এবং যাবতীয় ইবাদত মূলত সবরেরই একটি প্রকাশক্ষেত্র। তদুপরি এখানে নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; যা থেকে নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি আরো জোরালোভাবে সাব্যস্ত হয়। উপরন্তু নামায অবস্থায় বান্দা ইবাদতে মশগুল থাকার পাশাপাশি সকল গোনাহ ও পাপাচার থেকে এবং বিভিন্ন বৈধ কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকে, যা সবরের অর্থকে আরো মজবুত করে।

মোটকথা, সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে চলা সহজ হয়, যা তাঁর নৈকট্য ও মহব্বত এবং রহমত ও নুসরত লাভের ওসিলা হয়। এমনিভাবে বিপদ মসিবতে আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক সমর্পণ আল্লাহর রহমত ও দয়াকে আবশ্যক করে।

আর সালাত মুমিনের সর্বপ্রধান ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাধ্যমে যেমন ইবাদত আদায় করা হয়, তেমনি তার প্রভাবে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়; যেমনটি সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।
তাছাড়া নামাযের মধ্যেও বিভিন্নভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। যেমন সূরা ফাতেহায় তিলাওয়াত করা হয়—

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

“আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।”
এখানে ব্যাপকভাবে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা রয়েছে।
এমনিভাবে নামাযের বিভিন্ন দুআ-তাসবীহতেও রয়েছে বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের নানা প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা।
হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সবচে বেশি নিকটে থাকে। তাই সেই অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, সে সময়ের দুআ অবশ্যই কবুল হয়। এমনকি এ সময়ে কৃত নবীজীর একটি দুআও বর্ণিত হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

“হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট-বড়, প্রথম-শেষ, প্রকাশ-অপ্রকাশ্য সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিন।”
(দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২, ৪৮৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১২০)]

- *সালাতুল হাজত সম্পর্কিত হাদিস:*

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে ছোট বড় কোনো প্রয়োজন প্রার্থনা করা, বিশেষ কোনো কিছু চাওয়া কিংবা বিপদ মসিবত ও দুঃখ পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু-চার রাকাত নামায পড়ে দুআ করা—একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। এ আমলের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি হাদীস শরীফেও পাওয়া যায় বেশ কিছু বর্ণনা। ফিকহের পরিভাষায় এই নামাযকে বলে 'সালাতুল হাজত'।

বিখ্যাত সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন—

كَانَ النَّبيّ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ صَلَّى.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সমস্যা বা পেরেশানীর সম্মুখীন হতেন, নামাযে মগ্ন হতেন। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩১৯

হাদীসটির সনদ হাসান। [দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারী ৩/১৭২ (১৩০২ নং হাদীসের অধীনে।)]

হযরত আলী রা. বলেন—

لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ، وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلا نَائِمٌ، إِلا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّه كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ.

"আমি বদরযুদ্ধের রাতে দেখেছি, আমরা সকলে ঘুমিয়ে আছি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত। তিনি একটি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ছিলেন এবং দুআ করছিলেন।"

—মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৬১; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস ১১৮; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৮২৫ (হাদীসটির সনদ সহীহ)

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও ঈসা আ.-কে বিপদ ও মসিবতের কঠিন পরিস্থিতিতে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন—

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰي مُوْسٰي وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

“আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি আদেশ পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিশরে ঘর-বাড়ি স্থাপন কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে নামাযের স্থান বানাও এবং যথাযথভাবে নামায আদায় কর। আর ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।”

—সূরা ইউনুস: ৮৭

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, যখন মূসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের ওপর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কঠিন জুলুম-নির্যাতন শুরু হল এবং তারা তাঁদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি করল, তাঁদের জন্য চারপাশ সংকীর্ণ করে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা অধিক পরিমাণে নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন। যেমন নির্দেশ দিয়েছেন একথা বলে যে, (তরজমা) ‘তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও’। [—সূরা বাকারা (২) ১৫৬] আর আয়াতের শেষে বলেছেন—‘ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।’ অর্থাৎ তাদেরকে সওয়াব ও প্রতিদান এবং সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ দাও। —তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/২৮৯

সালাতুল হাজত বিষয়ে জামে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি বর্ণনা আছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় মান বিচারে বর্ণনাটি যয়ীফ বা দুর্বল। তবে এ বিষয়ে ‘হাসান’ পর্যায়ের বর্ণনাও রয়েছে।

যেমন মুসনাদে আহমাদে উল্লেখিত হয়েছে, সাহাবী আবুদ দারদা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا، أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلًا، أَوْ مُؤَخَّرًا.

“যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, এরপর পূর্ণাঙ্গরূপে দুই রাকাত নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রার্থিত বিষয় দান করবেন। শীঘ্রই অথবা কিছুকাল পর।”

—মুসনাদে আহমাদ, ২৭৪৯৭

আরেকটি সহীহ হাদীসে আছে যে, দৃষ্টিশক্তিহীন এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করল, আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেন।

নবীজী বললেন, তুমি চাইলে আমি দুআ করব। তবে তুমি চাইলে ধৈর্য ধরতে পার, সেটা তোমার জন্য উত্তম হবে।

সে বলল, আপনি দুআ করুন।

তখন নবীজী তাকে উত্তমরূপে ওযু করে দুই রাকাত নামায পড়তে বললেন। এরপর নিম্নোক্ত দুআর মাধ্যমে তার কাঙ্খিত বিষয়টি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে বললেন। দুআটি এই—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি এবং আপনার অভিমুখী হচ্ছি আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদের ওসিলায়। [হে নবী] আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের অভিমুখী হচ্ছি আমার এই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, যেন তা পূরণ করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করুন।"

—জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৫; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ১০৪২০

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন—

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

উল্লিখিত হাদীসটি থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসে। তন্মধ্যে নির্দিষ্ট প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নামায পড়ে দুআ করার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

- *কয়েকটি ঘটনা*
-

ইসলামী ইতিহাসে এবং ইসলামপূর্ব যুগেও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। তন্মধ্য থেকে দুয়েকটি ঘটনা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার তাঁর স্ত্রী 'সারা' রাযিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে এক দুশ্চরিত্র দাপুটে শাসকের এলাকা অতিক্রম করছিলেন। তখন সেই শাসক লোক পাঠিয়ে হযরত ইবরাহীম আ. ও তাঁর মুহতারামা স্ত্রীকে ডেকে নিল। আল্লাহর নবী ইবরাহীম আ. ঐ প্রতাপশালী শাসকের চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এরইমধ্যে ঐ শাসক যখন হযরত সারা রা.-এর দিকে হাত বাড়াতে গেল, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার হাত বাধাগ্রস্ত হল এবং মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এঁটে গেল। তখন সে অনুতপ্ত হয়ে সারা রা.-এর কাছে দুআ চাইল, যেন তার হাত স্বাভাবিক হয়ে যায়। তিনি দুআ করলে হাত স্বাভাবিক হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার হাত বাড়ানোর পর আরো কঠিন অবস্থা হওয়ায় সে তাঁকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে একজন দাসীকেও উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল।

হযরত সারা রা. তার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখলেন হযরত ইবরাহীম আ. নামাযে মগ্ন। এরপর তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা পাপাচারী কাফেরের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৭১; সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৫৮)

২. ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. হাফেয ইবনে আসাকির রাহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, দামেশকে এক ব্যক্তির একটা গাধা ছিল। সেটাকে সে ভাড়ায় খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন সে মালপত্র নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, এমন সময় এক লোক এসে বলল, আমাকে অমুক জায়গায় নিয়ে চলো। গাধার মালিক তাকে সাথে নিয়ে নিল। পথিমধ্যে সেই যাত্রী বলল, ওই পথ দিয়ে চলো, ওদিক দিয়ে পথ খুব সংক্ষিপ্ত।
গাধার মালিক বলল, আমি তো ওই পথ চিনি না।
সে বলল, আমি চিনি।
কিছু দূর যাওয়ার পর একটা বিরানভূমি দেখা গেল। আশপাশে কোনো লোকজন নেই। সেখানে গিয়ে ওই যাত্রী গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়ল এবং কোমড় থেকে খঞ্জর বের করে গাধার মালিককে আঘাত করতে উদ্যত হল।
গাধার মালিক ভয় পেয়ে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দাও, এই গাধা ও সমস্ত মালামাল নিয়ে যাও।
কিন্তু সে মানল না। বলল, এগুলো তো নেবই, সাথে তোমাকেও হত্যা করব। গাধার মালিক কাকুতি মিনতি করে প্রাণভিক্ষা চাইল। কিন্তু কাজ হল না। তারপর দিশেহারা হয়ে বলল, তাহলে আমাকে অন্তত দুই রাকাত নামায পড়তে দাও।
সে বলল, আচ্ছা, তাড়াতাড়ি কর।
গাধার মালিক নামাযে দাঁড়াল।
নামায শেষ হতে না হতেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। জনমানবহীন সেই উপত্যকায় অচেনা এক অশ্বারোহী হাজির হল এবং বর্শা দিয়ে ওই যাত্রীরূপী ডাকাতকে হত্যা করল। —তারীখে দিমাশক ৬৮/২৫১; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/২০৪-২০৫

৩. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মারফূ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাইলে একজন বুযুর্গের নাম ছিল জুরাইজ। তাঁর ওপর একবার এক নারী ব্যভিচারের অপবাদ দিল। এমনকি তার প্রসবকৃত সন্তানকে নিয়ে এসে বলল—এটি জুরাইজের মাধ্যমে হয়েছে।
এই অপবাদের কথা শুনে লোকজন ছুটে এল এবং তাঁর ইবাদতখানা ভেঙে দিল। তাঁকে তাঁর ইবাদতখানা থেকে বের করে আনল এবং বিভিন্ন মন্দ কথা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় জুরাইজ ওযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে সেই শিশু বাচ্চাটির কাছে গিয়ে বললেন—
হে শিশু! তোমার বাবা কে?
বাচ্চাটির জবান খুলে গেল এবং সে জানাল যে, তার বাবা অমুক রাখাল।
এ কথা শুনে লোকজন খুব অনুতপ্ত হল এবং তার ইবাদতখানাটি স্বর্ণ দিয়ে পুনঃনির্মাণের প্রস্তাব দিল। কিন্তু জুরাইজ রাজি হলেন না। বরং আগে যেমন ছিল তেমনি, মাটি দিয়ে নির্মাণের অনুমতি দিলেন। —সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৬
এসব ঘটনা থেকে সালাতুল হাজতের আমল ও তার ফায়েদা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

- *সালাতুল হাজতের নিয়ম:*

সালাতুল হাজতের নামায কমপক্ষে দুই রাকাত। তবে একই প্রয়োজনে বারবার দুই রাকাত করে অনেক রাকাত পড়তেও সমস্যা নেই।
এই নামায যেকোনো সাধারণ নফল নামাযের মতোই। সূরা কেরাত ও বিভিন্ন তাসবীহ একই। নিয়তের সময় শুধু খেয়াল থাকবে যে, আমি আমার নির্দিষ্ট প্রয়োজন /সকল প্রয়োজন, উম্মতের সকল প্রয়োজন পুরন হওয়ার জন্য দুই রাকাত নামায আদায় করছি।
নামাযের আগে অন্য নামাযের মতোই প্রথমে উত্তমভাবে ওযু করে নেবে। আগে থেকে ওযু অবস্থায় থাকলে তো ঠিক আছে। তার পরও নতুন ওযু করে নিলে ভালো।
উত্তমভাবে ওযু করার অর্থ হল, সুন্দরভাবে, ওযুর সব ফরয সুন্নত ও মুস্তাহাবের প্রতি পূর্ণ যত্নবান হয়ে, গুরুত্বের সাথে ওযু করা। দায়সারাভাবে কিংবা কোনো রকম শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ধোওয়া নয়।
সুযোগ থাকলে একথাও স্মরণ করা যে, ওযু হল পবিত্রতা অর্জনের একটি শরয়ী মাধ্যম। এটি মহিমান্বিত অনেক ইবাদতের পূর্ব প্রস্তুতি এবং এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয় এবং বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃত বিভিন্ন গোনাহ ধুয়ে যায়।

ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়। শেষে পড়তে হয়—
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِين.َ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। —জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫

এভাবে যত্নের সাথে ওযু করার পর পূর্ণ ধ্যান ও মনোযোগ এবং পূর্ণ খুশু ও খুযূর সাথে দুই রাকাত নামায পড়বে।
নামাযের পর আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসা করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবে। এটা সকল দুআর ক্ষেত্রেই কাম্য।
আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসার মাধ্যমে মূলত তাঁর শোকর আদায় করা হয়। বান্দার প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক ও সীমাহীন নিআমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। যা আল্লাহ তাআলার খুব পছন্দ।

দরূদ ও সালামের মাধ্যমে নবীজীর প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তেমনি প্রভূত কল্যাণ ও রহমত লাভ করা যায়। এছাড়াও দরূদ-সালামের অনেক ফায়েদা ও ফযীলত রয়েছে।
হামদ ও ছানা এবং দরূদ ও সালাম পেশ করার পর হাজত ও প্রয়োজন পূরণের প্রেক্ষিতে বর্ণিত হাদীসে শেখানো যে কোনো দুআ পড়বে। কিংবা নিজের মতো করে নিজের সব প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার কাছে তুলে ধরবে। কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ তাআলার কাছে নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং জীবনের সকল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খায়ের ও কল্যাণ প্রার্থনা করবে।

- *হাজত পূরণের দুআ:*

হাদীস ভাণ্ডারে বান্দার হাজত ও প্রয়োজন পূরণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। জামে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে একটি দুআর কথা এসেছে, সেটি খুব প্রসিদ্ধ। অত্যন্ত মর্মসমৃদ্ধ সেই দুআটি হলো—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

দুআটির অর্থ :
“আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যিনি অত্যন্ত সহনশীল ও পরম মমতাময়। আল্লাহ পবিত্র, যিনি আরশে আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের রব।
হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐসব জিনিস প্রার্থনা করি, যেগুলো আপনার রহমতকে অবধারিত করে এবং ঐসব জিনিস প্রার্থনা করি, যেগুলো আপনার ক্ষমাকে অনিবার্য করে।

(প্রার্থনা করি) সকল নেককাজের তাওফীক এবং সকল গোনাহ থেকে নিরাপত্তা। আপনি আমার কোনো গোনাহ ক্ষমা না করে ছাড়বেন না এবং কোনো পেরেশানী দূর করা থেকে বাদ রাখবেন না। আর আমার কোনো প্রয়োজন—যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে- তা অপূরণ অবস্থায় রেখে দিবেন না; হে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু!"
—জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৭৯; সুনানে ইবনে মাজাহ,১৩৮৪

[وفي إسناده فائد، وهو ضعيف، ولكن باب الدعوات والأذكار مما يتسامح فيه، والمتن ليس فيه شيء يستنكر -محمد عبد المالك (حفظه الله تعالى ورعاه])

- *ইসমে আযমের মাধ্যমে দুআ করা:*

যেকোনো প্রয়োজন পূরণ এবং যে কোনো দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি হল 'ইসমে আযম'-এর মাধ্যমে দুআ করা। হাদীস শরীফে ইসমে আযমের বিভিন্ন শব্দ-বাক্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন—
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (আমার কাঙ্খিত বিষয়) কামনা করছি। যেহেতু আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনিই আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি চির অমুখাপেক্ষী। (আপনি এমন সত্তা,) যিনি কাউকে জন্ম দেন না, কারো থেকে জন্ম নেন না। যার সমকক্ষ সমতুল্য কেউ নেই।"
—জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৭৫

এমনিভাবে—
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়) কামনা করছি। যেহেতু সকল প্রশংসা আপনার। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি এক। আপনার কোনো শরীক নেই। আপনি মহা অনুগ্রহশীল। যমীন ও আসমানসমূহের অতুলনীয় স্রষ্টা। আপনি মহিমময়, মহানুভব।
—সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৮৫৮

আরো আছে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّيْ أَسْأَلُكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়) কামনা করছি। যেহেতু সকল প্রশংসা আপনার জন্য। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি মহা অনুগ্রহশীল। হে যমীন ও আসমানসমূহের অতুলনীয় স্রষ্টা! হে মহিমময়, মহানুভব! হে চিরঞ্জীব হে মহানিয়ন্ত্রক! আমি আপনার কাছে (আমার কাক্সিক্ষত বিষয়) প্রার্থনা করছি।

—মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৫৭০

এইসব দুআর কোনো একটি পড়ে দুআ করা যায়। তাতে দুআ কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা হয়।

- *আল্লাহর কাছে চাওয়া বিফলে যায় না:*

বান্দার দুআ ও প্রার্থনা আল্লাহ তাআলার কাছে খুব পছন্দ। আল্লাহ তাআলা চান, বান্দা নিয়মিত তাঁর কাছে দুআ করুক। সকল প্রয়োজন তাঁর কাছেই পেশ করুক। বান্দার এই আল্লাহমুখিতা ও মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ তাআলার খুব প্রিয়। এ মর্মেই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

“তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”

—সূরা গাফির (৪০) : ৬০

এই আয়াতে ‘আমাকে ডাক’ অর্থ হল, আমার বন্দেগী কর এবং আমার কাছে চাও।

—তাফসীরে কাশশাফ ৪/১৭৫

‘সাড়া দেব’ অর্থ হল, আমি তোমাদের ইবাদতের প্রতিফল দেব এবং তোমাদের দুআ কবুল করব, তোমাদের চাওয়া পূর্ণ করব।

আয়াতের শেষাংশে বলেছেন, যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে অর্থাৎ সকল ইবাদাত, দুআ ও আল্লাহকে ডাকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

নিঃসন্দেহে অন্যান্য ইবাদতের মতো আল্লাহকে ডাকা এবং তাঁর কাছে দুআ করা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। বরং আল্লাহর কাছে চাওয়া ও দুআ করাকে হাদীসে ইবাদতের মূল বলা হয়েছে। (দ্র. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৭৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩২৪৭)
দুআর ক্ষেত্রে কিছু আদব যেমন আছে, তা কবুল হওয়ার কিছু শর্তও আছে। এ বিষয়ে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়।

যেমন বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ.

আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআ কবুল করে থাকেন—যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গোনাহ কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করে এবং দুআ কবুলে তাড়াহুড়ো না করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তাড়াহুড়ো কীভাবে হয়? অথবা কাকে তাড়াহুড়ো বলা হয়?
নবীজী বললেন—

يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

বান্দা বলে, আমি তো দুআ করেছি, আমি তো দুআ করেছি; কিন্তু কবুল হতে দেখিনি। তাই সে নিরাশ হয়ে যায় এবং দুআ করা ছেড়ে দেয়।
—সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৩৫

অন্য হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَه دَعْوَتُه، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَه فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا . قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ؟ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ.

মানুষ যে কোনো দুআ করে, যদি তাতে কোনো গোনাহ কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করার বিষয় না থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি দান করেন। হয়তো তৎক্ষণাৎ তার দুআ কবুল করা হয় অথবা তার দুআর ফল আখেরাতের জন্য রেখে দেওয়া হয় কিংবা তাকে কোনো মন্দ বিষয় থেকে হেফাযত করা হয়।
সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক দুআ করব।
নবীজী বললেন, তাহলে আল্লাহও অনেক দেবেন এবং আল্লাহর দেওয়াই বেশি।

—মুসনাদে আহমাদ,১১১৩৩

মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো প্রয়োজনে মুমিন প্রথমেই আল্লাহ-অভিমুখী হবে। আল্লাহ তাআলার কাছেই নিজের সকল প্রয়োজন পেশ করবে। তাঁর কাছ থেকেই কল্যাণের ফায়সালা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে নামায ও দুআর মাধ্যম অবলম্বন করবে। পাশাপাশি সাধ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। মনে রাখবে, আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার দুআ-মুনাজাতের যেমন প্রতিদান রয়েছে, চেষ্টা মেহনতেরও রয়েছে অনেক মূল্য ও প্রতিদান। নিঃসন্দেহে বান্দার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলার হুকুমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সালাতুত তাওবা

তওবা শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো *অনুশোচনা বা পুনরায় পাপ না করার সংকল্প।* ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নিজের কৃত অপরাধের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে অপরাধ বা গুনাহ না করার দৃঢ়সংকল্প করাকে তওবা বলে। আর গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়ার পরপরই মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়াকে সালাতুত তওবা বা তওবার নামাজ বলে।

এই নামাজের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। তওবার নামাজ অন্যান্য নফল নামাজের মতো করে আদায় করবে। এর জন্য পৃথক কোনো নিয়ম নেই। অর্থাৎ, কেউ তওবার নামাজ পড়তে চাইলে এভাবে নিয়ত করতে হবে যে, হে আল্লাহ! দু'রাকাত তওবার নামাজ আদায় করছি, আপনি কবুল করুন। এরপর অন্যান্য নামাজের মতো সূরা-কেরাত, তাশাহুদ, দরুদ পড়ে সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

নিষিদ্ধ ও মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া যেকোনো সময় তওবার নামাজ পড়া যাবে। তওবার নামাজের পর আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে দোয়া করা উত্তম। এসময় থেকে আর কখনো পাপ কাজে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে মনের সব আকুতি জানিয়ে রাখতে পারেন।

শয়তান এবং নফসের ধোকায় পড়ে মানুষ পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। তবে পাপে জড়িয়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হওয়া এবং তওবা করা একজন মুমিন ও মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সা. বলেছেন, *'ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা পাপকাজে লিপ্ত না হতে, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে তোমাদের পরিবর্তে এমন নতুন এক জাতিকে নিয়ে আসতেন, যারা গুনাহ করবে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং গুনাহ মাফ করবেন।' (মুসলিম : ২৭৪৯)*

- *তওবার গুরুত্ব :*

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ বারবার গুনাহ করে ফেলে, আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। তবে মানুষ যত গুনাহ-ই করুক না কেন তাকে নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ করতে আল্লাহ তায়ালা সবসময় তওবার দরজা খুলে রেখেছেন। কোরআন ও হাদিসে মুসলিম জাতিকে বারবার তওবা ও ইস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং তাদেরও ভালোবাসেন যারা পবিত্র থাকে।'*
(সুরা : বাকারা, ২২২)

অন্যত্র বলা হয়েছে, *'যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।'*
-(সুরা, ফুরকান: ৭০)

আরও বলা হয়েছে, *'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।*
-(সূরা নূর, ৩১)

আরও বর্ণিত হয়েছে, *' তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর।*
-(সূরা হূদ, ৩)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, *‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা।’*
-(সূরা তাহরীম, ৮)

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,*'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর দরবারে 'তওবা' করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আমিও প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করি।' -(বুখারি, ২৭০২)*

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– *‘সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা পাপ না কর, আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। -(মুসলিম,* ২৭৪৮)

- *অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকা:*

তবে অভিশপ্ত শয়তান যেহেতু মানুষকে আপন রবের পথ থেকে সরিয়ে বিপথগামী করার পায়তারা করে সবসময় তাই তওবা করার পরেও মানুষ অনেক সময় আবারও পাপাচারে লিপ্ত হয়। নিজের ওপর জুলুম করে ফেলে। মুমিন মাত্রই গুনাহ হয়ে গেলে মনে অনুতাপ জাগে, আল্লাহর ভয় জাগে এবং এই উপলব্ধি জাগে যে, আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। তখন সে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়।

‘আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না’
গুনাহ হয়ে গেলে স্বভাবতই সবাই অনুতাপে ভোগেন, পরবর্তী করণীয় ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কেউ আবার আপন পাপাচারেই অটল থাকেন, যা আদৌ কাম্য নয়। কারণ পাপ হয়ে গেলে আবারও সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নেওয়া উচিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
(হে রাসুল আপনি) বলুন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- (তোমরা) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'
-(সুরা যুমার : আয়াত, ৩৯)

আয়াতের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি ঈমান আনে অথবা সত্য হৃদয়ে তওবা করে প্রকৃত অর্থে সে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাবে, তার পাপ যদি সমুদ্রের ফেনা বরাবরও হয়, তবুও তা মাফ হয়ে যাবে।

বান্দার গুনাহ আল্লাহ প্রতিবারই ক্ষমা করে দেন!

বান্দা গুনাহ করে বারবার তওবা করলে প্রতিবারই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। পাপ করার পর ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– *'সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা পাপ না কর, আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। -(মুসলিম, ২৭৪৮)*

বারবার তওবার কথা বলেছেন রাসুল সা.:

মানুষের বারবার গুনাহ ও তওবার বিষয়ে এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনও এক ব্যক্তি গুনাহ করার পর বলল, হে আল্লাহ! আমি গুনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গুনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।

তারপর সে আবার আরেকটি গুনাহ করে আবারও বলল, হে রব! আমি গুনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গুনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *(হে রাসুল আপনি) বলুন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- (তোমরা) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'*

-(সুরা যুমার : আয়াত, ৩৯)

তারপর সে আবার আরেকটি গুনাহ করে আবারও বলল, হে রব! আমি গুনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং এটা

জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গুনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন। -(বুখারী, ৭৫০৭, মুসলিম, ২৭৫৮)

হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম-সন্তানের মাঝে শয়তানের স্পর্শ আছে এবং ফিরিশতারও স্পর্শ আছে। শয়তানের স্পর্শ হল, মন্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করা। আর ফিরিশতার স্পর্শ হল, ভালোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে সত্যজ্ঞান করা।
সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরিশতার স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন বোঝে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সে যেন তাঁর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্যটির স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।'
-(তিরমিজি, ২৯৮৮)

- *তওবা কবুলের শর্ত:*

মানুষের উচিত যথা সম্ভব শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এমনভাবে তওবা করা যেন তিনি তা কবুল করেন। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবা কবুল ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য **তিনটি শর্ত** রয়েছে। যেমন:

১) পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।
২)পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।
৩) ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে।

- *তওবা কবুলের সময়সীমা:*

তিন মুহূর্ত আসার আগ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার বান্দার তওবা কবুল করেন। কিন্তু এরপর আর তওবা কবুল করা হয় না।
সেই তিন মুহূর্ত হলো-

ক. মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত।
সুরা আন নিসা : ১৮

খ. আজাব চলে আসার আগ পর্যন্ত। সুরা মুমিনুন : ৮৫
গ. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত। মুসলিম : ৬৭৫৪

- *তওবার নামাজের নিয়ম :*

তওবার নামাজের পদ্ধতি ওপরে উল্লিখিত হজরত আবু বকর (রা.)-এর হাদিসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। প্রথমে উত্তমরূপে অজু করতে হবে। তারপর একাগ্রচিত্তে নফল নামাজের মতো দুই রাকাত নামাজ পড়বে। তওবার নামাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সুরা নেই। যেকোনো সুরা দিয়েই তওবার নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের অজু ও নামাজের মাঝখানে কোনো দুনিয়াবি কাজ বা কথা না বলা উত্তম। কারণ হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মতো এভাবে অজু করবে, অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং এর মাঝখানে দুনিয়ার কোনো খেয়াল করবে না, তার আগের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারী: ১৫৯)
নামাজ শেষে তাসবিহ-তাহলিল পড়বে, আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং ইস্তিগফার পড়ে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

সায়্যিদুল ইস্তেগফারঃ

সায়্যিদুল ইস্তিগফার (- Sayyidul Istighfar) বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে'।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : 'হে (দয়াময়) আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতির

ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। আমি আমার নিকৃষ্ট আমল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনার যে অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করছি এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমি আমার কৃত অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই।'

সুনানে আবু দাউদ : ৫০৭০

উল্লেখ্য, কারও এই দোয়া মুখস্থ করা সম্ভব না হলে সে নিজের ভাষাতেও মহান আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে তওবা করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

সালাতুত শোকর (শুকরিয়ার নামাজ)

আল্লাহর নেয়ামত অসীম। বান্দার পক্ষে তা গণনা করা সম্ভব নয়। আবার সেসব নেয়ামতের শোকর আদায়ের সময়সীমারও অন্ত নেই। বান্দার দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনে আল্লাহর অশেষ নেয়ামতের শোকর পরিপূর্ণভাবে আদায় করা অসম্ভব। এরপরও বান্দাকে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে যেতেই হবে। কখনও বান্দা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না। এটিই হলো সৃষ্টিকর্তার বিধান।

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তা হলে আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।'* (সুরা বাকারা : ১৫২)

ইসলামী পরিভাষায় আনন্দ বা সুখের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলা হয়। রাসুল সা. একাধিক হাদিসে সেজদায়ে শুকরিয়া আদায় করার কথা বলেছেন। তবে এ সেজদা থেকে উদ্দেশ্য হলো দুই রাকাত নামাজ পড়া, যাকে সালাতুশ শোকর বা সেজদার নামাজ বলা হয়।

হজরত আবু বকরা (রা.) বলেন, *'যখন নবী করিম (সা.)-এর নিকট কোনো খুশির সংবাদ বা এমন কিছু পৌঁছত যাতে তিনি সন্তুষ্ট হতেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন।'* (আবু দাউদ : ২৭৭৬)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণনা মতে, সেজদায়ে শোকর বাক্যটির মধ্যে ‘সেজদা’ দ্বারা রূপক অর্থে নামাজকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়া অনুযায়ী অজু সহকারে কেবলামুখী হয়ে একটা সেজদা দেওয়ার মাধ্যমেও শুকরিয়া আদায় করা যায়।

সুতরাং কোনো মুমিন বান্দা যদি দুই রাকাত নফল নামাজ দ্বারা শুকরিয়া আদায় করে- তখন তাকে সালাতুশ শোকর বলবে। আর একটা সেজদার মাধ্যমে যদি শুকরিয়া আদায় করে তখন তাকে সেজদায়ে শোকর বলবে। এ উভয় পদ্ধতিতে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা যাবে। সালাতুশ শোকরের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু দুই রাকাতের কম না হওয়া চাই। আর তা নিষিদ্ধ ও মাকরুহ সময়ে আদায় করা যাবে না। সালাতুশ শোকরের স্বতন্ত্র কোনো নিয়ম নেই, বরং অন্যান্য নফল নামাজের মতো করেই আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ৭/১২৫

৩য় অধ্যায়ঃ নফল নামাজের গুরুত্ব ও উপকারিতাঃ

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। মানুষ যখন তার পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজ ও প্রয়োজন আল্লাহর হুকুম ও রাসুল (সা.)-এর সুন্নত মোতাবেক হবে, তখন তাঁর প্রত্যেকটি কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে বান্দা সওয়াব লাভ করবে।
কিন্তু এরপরও প্রত্যেক মুসলিমের মৌলিক ইবাদত রয়েছে, যেগুলো করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে। কারণ, নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।
নিম্নে নফল নামাজের কিছু উপকারিতা আলোচনা করা হলো:

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ :

মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল সালাত অন্যতম। এ সালাতের
মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হ’তে পারে।

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّه ،ُ

'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি।'
(বুখারী:৬৫০২; মিশকাত:২২৬৬)

২.রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য :

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল সালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার সওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে।
রবী'আহ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন,
كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود ِ
'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর'।
(মুসলিম,মিশকাত ৮৯৬)

৩. জাহান্নামের আগুন হারাম :

যারা ফরয সালাতের সাথে সাথে নফল সালাত আদায় করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار ،ِ

'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'।

(আবু দাউদ:১২৬৯; তিরমিযি ৪২৮;মিশকাত ১১৬৭)

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّار ،ُ

'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।

(মুসনাদে আহমদ:২৬৮০৭; নাসাঈ:১৮১৭)

৪.বেশি বেশি নফল জান্নাত লাভের মাধ্যম:

মাদান ইবনে আবু তালহা (রহ.) বলেন, আমি নবীজির আজাদকৃত (স্বাধীন করে দেওয়া) গোলাম ছাওবান (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে! তিনি বলেন, অথবা আমি বলেছি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলের কথা বলে দিন। এভাবে তিন বার জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আমিও নবী কারিম (সা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন—
‘তুমি বেশি বেশি সিজদা করো (নফল নামাজ)। কেননা তোমার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং একটি গোনাহ মিটিয়ে দেবেন।’
মাদান বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি আবু দারদা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনিও একই উত্তর দিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৮৮)

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবীজি (সা.) তাকে বললেন- জেনে রাখো, তোমার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং একটি গোনাহ মিটিয়ে দেবেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২২০)

৫.ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ :

আল্লাহ তা‘আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন জরুরী, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত জরুরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয সালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ،
‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহ’লে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহ’লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহ’লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি

পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে' (যেমন সালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।
(আবু দাউদ:৮৬৪; তিরমিজি: ৪১৩; মিশকাত:১৩৩০)

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া, নে'মত ও অনুগ্রহের অন্যতম হ'ল, তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাতের বিধান দিয়েছেন, শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। যাতে মুসলমান বান্দা তার ফরয সালাতের ঘাটতি নফল সালাত দ্বারা পূর্ণ করতে পারে'।
(রিয়াদুস সলিহীন:১৩২৪)

৬.মর্যাদা উন্নতকরণ :

নফল সালাত মুসল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নফল সালাত। মা'দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্তদাস সাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম,

أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً،

'আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন'।
(মুসলিম:৪৪৮; মিশকাত:৮৯৭)

৭. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি:

নফল নামাজ মনকে শান্ত করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। নিয়মিত নফল নামাজ আদায়কারীর অন্তর বিনয়ী হয়, রাগ-অহংকার দূর হয় এবং তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। এটি মানুষের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে রাখে, ফলে দুঃখ-কষ্টেও মন স্থির থাকে।

চতুর্থ অধ্যায় : কুরআনের আলোকে নফল নামাজ

১. নফল ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতসমূহঃ

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বহু স্থানে বান্দাকে অতিরিক্ত ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যদিও "নফল নামাজ" শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখিত নয়, তবুও স্বেচ্ছা ইবাদতের ধারণা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন —

"রাতের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত। হয়তো তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।"
— সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭৯

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদের নফল ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাঁর সন্তুষ্টি ও উচ্চ মর্যাদা অর্জনের পথ।

এছাড়া কুরআনে আরও বলা হয়েছে—
"যারা রাতের বেলায় তাদের প্রভুর সামনে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, তারা জান্নাতের যোগ্য।"
-সূরা আস-সাজদা, আয়াত ১৬

এই আয়াত নফল ইবাদতকারীদের মর্যাদা ও আখিরাতে তাঁদের পুরস্কার বর্ণনা করছে।

আরও এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, "*যারা তাদের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে ও তাঁর শাস্তি থেকে ভয় পায়, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগান।*"
-সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৪

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, নফল নামাজ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কুরআনুল কারীম নফল ইবাদতকে আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

২.সাহাবায়ে কেরামের নিকট নফল নামাজের মর্যাদা:

ক) নফল নামাজকে সুন্নতের প্রতিভালোবাসার নিদর্শন মনে কর:

সাহাবারা নফল নামাজকে রাসুল ﷺ এর সুন্নত ও তার অনুসরণের শক্ত প্রমাণ মনে করতেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন:
"আমার প্রিয় রাসুল ﷺ আমাকে তিনটি বিষয় কঠোরভাবে وصيّت করেছেন— দু'রাকাত দুহা, বিতর নামাজ এবং ঘুমানোর আগে দু'রাকাত।"
(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

এ থেকে বোঝা যায়, তারা নফল ইবাদতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত।

খ) তাহাজ্জুদকে তাদের রাতের নিয়মিত ইবাদত করা:

অনেক সাহাবী প্রতিদিন রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাতের অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদে কাটাতেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) বলেন:

“রাসুল ﷺ এর ওফাতের পরও সাহাবারা তাহাজ্জুদ ত্যাগ করেননি।”

এটি প্রমাণ করে যে নফল নামাজ তাদের জীবনধারার অংশ ছিল।

গ) মসজিদে নফল ইবাদতে সময় ব্যয় করা:

সাহাবাদের একটি দল মসজিদে এসে দীর্ঘ সময় নফল নামাজ আদায় করতেন। তারা মনে করতেন নফল নামাজ আত্মাকে সুন্নতের আলোয় ভরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর রহমতকে নিকটে টেনে আনে।

ঘ) রাসুল ﷺ এর সাহচর্যে নফল নামাজের অনুশীলন বাড়ানো:

রাসুল ﷺ নফল নামাজের প্রতি উৎসাহ দিতেন, আর সাহাবারা তা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন।তিনি বলেন:
“আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।”
(সহিহ বুখারি)

এই হাদিস সাহাবাদের মনকে নফল ইবাদতের প্রতি অতি আগ্রহী করে তো

ঙ) মসজিদে নববীতে দীর্ঘ নফল নামাজ আদায় করা:

অন্য বর্ণনায় এসেছে,
আলী (রাঃ), উসমান (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) রাতে দীর্ঘ সময় ধরে মসজিদে নফল নামাজ পড়তেন।

চ) ধন-সম্পদ থাকলেও নফল আমলে অগ্রাধিকার:

সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই বিত্তশালী ছিলেন—উসমান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), জুবাইর (রাঃ)। তবুও তারা নফল নামাজকে দুনিয়ার ব্যস্ততার উপরে স্থান দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে নফল নামাজ ছিল আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার প্রধান মাধ্যম।

ছ) রমজান ও অন্যান্য বিশেষ সময়ে অতিরিক্ত নফল:

রমজানে নফল ইবাদত সাহাবাদের জীবনে বিশেষ স্থান পেত। তারা দীর্ঘ সময় কিয়ামুল লাইল (তারাবিহ + তাহাজ্জুদ) করতেন। ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ রাকাত পড়া অনেকের স্বভাব ছিল।

জ) নফল ইবাদত দিয়ে ঈমান শক্তিশালী করা:

সাহাবারা জানতেন সুন্নত ও নফল ইবাদত ছাড়া ঈমান সম্পূর্ণ হয় না।
তাই তারা নফল নামাজকে ঈমানের পরিপূর্ণতা হিসেবে দেখতেন।

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নফল নামাজ ছিল আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য অর্জনের উপায়, ঈমান শক্তির প্রমাণ, নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম ও রাসুল ﷺ এর সুন্নত অনুসরণের মর্যাদাপূর্ণ পথ।

৩.কুরআনের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত নফল ইবাদতের মর্যাদা:

ইবাদতের ফজিলত কুরআনুল কারীমে অতিরিক্ত বা স্বেচ্ছা ইবাদতের অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

ক) আল্লাহ তায়ালা বলেন —

"যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে তার দশগুণ প্রতিদান পাবে; আর যে ব্যক্তি আরও বেশি করে সৎকাজ করে, আমি তার প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দেব।"
-সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৬০

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার নফল ইবাদতকে অগণিত সওয়াব দ্বারা পুরস্কৃত করেন।
অন্যত্র বলা হয়েছে —

"যারা সিজদা করে ও নামাজে স্থির থাকে, আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের বাগানসমূহ প্রস্তুত রেখেছেন।"
— সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১১১

খ)আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۙ
اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ

“অগ্রগামীরা তো অগ্রগামী; তারাই আল্লাহর নিকটবর্তী।
— সূরা ওয়াকিয়া: ১০–১১

এখানে “অগ্রগামী” বলতে অতিরিক্ত ইবাদতকারী, নফল আমলে উন্নত মানুষদের বোঝানো হয়েছে।

গ) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ
“রাতের কিছু অংশে (কুরআন সহ) তাহাজ্জুদ পড়ো; এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত।”
— সূরা ইসরাঃ ৭৯

এখানে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে নফল ইবাদতের উল্লেখ করেছেন। রাসুল ﷺ এর জন্য আদেশ হলেও উম্মতের জন্য এতে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।

ঘ)আল্লাহ তায়ালা বলেন,
اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ؕ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۖ

মুত্তাকিগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের ভেতর থাকবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা-কিছু দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা তো এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল।তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত।”
— সূরা যারিয়াত: ১৫–১৭

এখানে “রাতে অল্প ঘুমানো” বলতে রাতের নফল ইবাদত–তাহাজ্জুদ বোঝানো হয়েছে।

ঙ) সেজদার মাধ্যমে রাতের নফল কুরআনে গুরুত্ব পেয়েছে।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

(রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় ৮ এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে।
—আস সিজদাহ্ - ১৬

অর্থাৎ তারা নফল নামাজের জন্য রাতে বিছানা ত্যাগ করে।
এরপর আল্লাহ বলেন—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم

"তারা যে পুরস্কার পাবে, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না।"
-আস সাজদাহ-১৭

চ) আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"
— সূরা আনকাবুত:৪৫
নফল সালাত বেশি করলে এই নৈতিক উন্নতি আরও শক্তিশালী হয়।

ছ)দোয়া কবুলের বিশেষ সময় হলো রাত্রির শেষ ভাগ।

যদিও এটি সরাসরি হাদিসে এসেছে, কিন্তু কুরআনেও রাতের শেষ ভাগে ইবাদতের ফজিলত উল্লেখ আছে:

﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

-সূরা যারিয়াত: ১৮
"তারা সাহরির সময় ক্ষমা প্রার্থনা করত।"

এটি তাহাজ্জুদের সময়। অতিরিক্ত নফল ইবাদতকারীই এই সময় জাগে।

জ) আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য: নফল ইবাদতে দৃঢ়তা

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

— সূরা ফুরকান: ৬৪
"যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের জন্য সিজদা ও দাঁড়িয়ে।"

এটি সরাসরি রাতের নফল নামাজের প্রশংসা।

কুরআন বারবার অতিরিক্ত ইবাদতকারী মানুষদের প্রশংসা করেছে এবং তাদের রাতের নামাজ, সেজদা, বিনয়, ধৈর্য ও আখিরাত সচেতনতার কথা উল্লেখ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায় : হাদীসের আলোকে নফল নামাজ

১.রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নফল নামাজের অভ্যাস:

নবী করিম ﷺ তাঁর জীবনে নফল নামাজের গুরুত্ব বাস্তবভাবে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর জীবন ছিল ইবাদতের পরিপূর্ণ উদাহরণ।
তিনি রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করতেন।
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন —

"নবী ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজের সময় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা ফেটে যেত।"
— সহিহ বুখারি

তাঁর নফল নামাজের মধ্যে ছিল — তাহাজ্জুদ, দুহা, ইস্তিখারা, সালাতুত তওবা, সালাতুল হাজত, এবং ফরজ নামাজের আগে ও পরে সুন্নাত নামাজসমূহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন —

"ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।"
— সহিহ মুসলিম

তিনি আরও বলেন —

"রাতের নামাজ হলো মুত্তাকীদের মর্যাদা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।"

নবী করিম ﷺ কখনও নফল নামাজ অবহেলা করতেন না, এমনকি সফরে থাকলেও তিনি কিছু নফল নামাজ আদায় করতেন। এটি প্রমাণ করে, নফল নামাজ তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

২. হাদীসে নফল নামাজের ফজিলত

হাদীসে নফল নামাজের অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, যা একজন মুমিনের জীবনকে আলোকিত করে।
রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"আমার বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটে আসে, আমি তাকে ভালোবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে; আমি তার দৃষ্টি হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে।"
— সহিহ বুখারি (হাদীস ৬৫০২)

অন্য এক হাদীসে এসেছে —

"রাতের নামাজ তোমাদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করে এবং শরীরে প্রশান্তি আনে।"
— মুসনাদ আহমাদ

এছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন —

"যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাআত নফল নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।"
— সহিহ মুসলিম

এই হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, নফল নামাজ শুধুমাত্র অতিরিক্ত ইবাদত নয় বরং আল্লাহর ভালোবাসা, গোনাহ মাফ, রিজিক বৃদ্ধি এবং জান্নাতের নিশ্চয়তার পথ।

৩.নফল নামাজ সম্পর্কিত হাদিস

ক) আল্লাহ তাআলা বলেন:
"আমার বান্দা ফরজ ইবাদতের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি"
— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৫০২

এই হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে নফল ইবাদত আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের বড় উপায়।

খ) রাসূল ﷺ বলেছেন—
"সালাত মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ; যতক্ষণ সে তা নষ্ট না করে।"
— সহিহ মুসলিম

অর্থাৎ নফলসহ সব নামাজ বান্দাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করে।

গ) রাসূল ﷺ বলেছেন—
"ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ)।"
— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৬৩

ঘ) রাসূল ﷺ বলেছেন—
"প্রত্যেক জোড়ার হাড্ডির পক্ষ থেকে প্রতিদিন সদকা দিতে হয়। দুহা নামাজের দুটি রাকাত এ সবের জন্য যথেষ্ট।"
— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৭২০

ঙ) রাসূল ﷺ বলেছেন—
"তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেবে।"
-সহিহ বুখারি ৪৪৪, মুসলিম ৭১৩

চ) রাসূল ﷺ বলেছেন—
"তোমরা রাতের নামাজ আদায় করো; এটি পূর্বের সৎকর্মীদের আমল, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায়, গুনাহ মোচনের কারণ এবং শরীর থেকে রোগ দূর করে।"
— তিরমিজি, হাদিস: ৩৫৪৯

ছ) রাসূল ﷺ বলেছেন—
"আল্লাহ রমজানের রাতে কিয়াম (তারাবিহ ও অন্যান্য নফল) করা ফরজ করেননি; তবে তোমরা তা করো।"
— সহিহ বুখারি, হাদিস: ২০

ছয় অধ্যায় : নফল নামাজের ব্যক্তিগত,পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবঃ

১. ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব

(ক) আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহর নৈকট্য:

নফল নামাজ মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয়কে দৃঢ় করে। মন থেকে গুনাহের প্রবণতা কমে। ইবাদতের প্রতি গভীর আগ্রহ জন্ম নেয়।
আত্মার প্রশান্তি ও ঈমান বাড়ে।

(খ) মানসিক প্রশান্তি ও স্ট্রেস কমানো:

নফল নামাজ মানুষকে মানসিকভাবে স্থির করে। দুশ্চিন্তা, হতাশা ও ভয় কমে। মন স্থির হয়ে চিন্তাশক্তি বাড়ে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত ইবাদত মস্তিষ্কে ইতিবাচক হরমোন নিঃসরণ বাড়ায়, যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

(গ) আত্ম-সংযম ও চরিত্র নির্মাণ:

নফল নামাজ ধৈর্য, নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। রাগ, হিংসা, হঠকারিতা, অহংকার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
বিনয়, ক্ষমাশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি করে।

(ঘ) সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা তৈরি:

নফল নামাজের জন্য সময় বের করতে গেলে- সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়ে। কাজের প্রতি শৃঙ্খলা তৈরি হয়। আলস্য, অগোছালো জীবনযাপন কমে যায়।

(ঙ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিপক্কতা:

নফল নামাজ মন পরিষ্কার করে, ফলে—বিবেচনা শক্তি বাড়ে। ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা কমে।

আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। মানুষ পরিস্থিতি বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

(চ) গুনাহ থেকে বিরত থাকার শক্তি:

যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ইবাদতে অভ্যস্ত হয়, তার মধ্যে আল্লাহভীতি বাড়ে। হারাম কাজ, খারাপ সঙ্গ বা অন্যায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। নিজেকে সঠিক পথে রাখার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(ছ) আত্মিক শান্তি ও সুখ অনুভব:

নফল নামাজ অন্তরে রহমত ও প্রশান্তি এনে দেয়। হৃদয়ের কষ্ট, দুঃখ বা চাপ লাঘব হয়। ভিতরে এক ধরনের আলোকিত, প্রশান্ত অনুভূতি তৈরি হয় যা বাহ্যিক কোনো বস্তু দিতে পারে না।

(*জ) দুনিয়া ও আখিরাত সচেতনতা:*

নফল নামাজ মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করায়। মৃত্যুচিন্তা ও আখিরাতের প্রস্তুতি তৈরি হয়।
দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি কমে। জীবনের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি তৈরি হয়।

(ঝ) আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভের আশা:

হাদিসে এসেছে, একটি নফল ইবাদত কখনো কখনো বান্দাকে তার গুনাহ থেকে মুক্ত হতে এবং আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা অর্জন করতে সাহায্য করে।
নফল নামাজ মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে নিয়ে যেতে পারে।

নফল নামাজ ব্যক্তির জীবনকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করে—
তার মন, চরিত্র, আচরণ, আত্মা এবং জীবনযাত্রায় প্রশান্তি, শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে দেয়। ফলে একজন ব্যক্তি শুধু আধ্যাত্মিকভাবে নয়, ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা এবং বাস্তব জীবন পরিচালনাতেও উন্নত হয়ে ওঠে।

২. পারিবারিক জীবনে প্রভাব

(ক)দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও সুসম্পর্ক:

নফল নামাজ মানুষকে শান্ত, ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল করে। দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া, মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝি কমে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পর্ক আরও সুন্দর হয়।

(খ)পরিবারে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি:

পরিবারে কেউ নিয়মিত নফল নামাজ পড়লে বাকি সদস্যরাও প্রভাবিত হয়। ঘরে ইবাদতের পরিবেশ তৈরি হয়। সন্তানরা বড়দের দেখে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হয়। ঘরের ভেতর আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার বাতাবরণ তৈরি হয়।

(গ)সন্তানদের নৈতিক ও চারিত্রিক গঠন:

নফল নামাজ পড়া মা-বাবা সন্তানের বাস্তব রোল মডেল হয়।
সন্তানরা নামাজের গুরুত্ব বুঝে।
সত্যবাদিতা, ধৈর্য, বিনয়, দায়িত্ববোধ—এসব গুণ সন্তানের মাঝে তৈরি হয়। মানসিকভাবে পরিপক্ক, শান্ত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শিশু গড়ে ওঠে।

(ঘ)পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া:

একই পরিবারের সদস্যরা যখন একসাথে ইবাদত করে বা ইবাদতের পরিবেশ শেয়ার করে। তাদের মধ্যে আবেগী সংহতি বাড়ে। পরিবারে একতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। ছোট-বড় সকলের মাঝে ভালবাসা ও আত্মিক সম্পর্ক মজবুত হয়।

(ঙ)পরিবারে সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি:

নফল নামাজ মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরিবার পরিচালনায় আরও সচেতন হয়।
সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি, সাহায্যের মনোভাব ও উদারতা বৃদ্ধি পায়। ঘরে ঝগড়া না করে সমস্যা সমাধানে শান্তিপূর্ণ আচরণ দেখা যায়।

(চ) মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতি, যা পরিবারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে:

নফল নামাজ মানসিক চাপ কমায়। অতিরিক্ত টেনশন, উদ্বেগ বা হতাশা কমলে পারিবারিক সম্পর্কও উন্নত হয়। পরিবারে অস্থিরতা কমে, দায়বদ্ধতা ও ইতিবাচক মনোভাব বাড়ে।

(ছ)সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ভূমিকা:

ইবাদতকারী ব্যক্তি অপচয়, অশ্লীলতা ও নেতিবাচক অভ্যাস থেকে দূরে থাকে। ফলে অযথা ব্যয়সহ অর্থনৈতিক ক্ষতি কমে। পরিবারে সঞ্চয়, পরিকল্পনা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(জ) দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্ত মনোভাব:

নফল নামাজ মানুষকে ক্ষমাশীল হতে শেখায়। এ কারণে পরিবারে ঝগড়া বা ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব সহজে মিটে যায়। বড় সমস্যাও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা সহজ হয়।

নফল নামাজ ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি পরিবারকে একটি শান্ত, নৈতিক, দায়িত্বশীল ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে গড়ে তোলে। এটি পরিবারকে শুধু ধর্মীয়ভাবে নয়, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত করে—
যা একটি সুখী পরিবার গঠনে অপরিহার্য।

৩. সামাজিক জীবনে প্রভাব

সামাজিক জীবনে নফল নামাজের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক। নফল নামাজ শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়—এটি মানুষের চারিত্রিক উন্নয়ন, নৈতিকতা, সামষ্টিক আচরণ ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে বিষয়টি সংক্ষেপে এবং গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হলো:

ক) নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে প্রভাব:

নফল নামাজ মানুষকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-শুদ্ধির দিকে ধাবিত করে। নিয়মিত নফল নামাজ আদায়কারী মানুষ সহজেই রাগ, হিংসা, লোভ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এটি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি গুণ তৈরি করে।
ফলে সমাজে নৈতিকভাবে পরিশীলিত নাগরিক তৈরি হয়।

খ) আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়ন:

নফল নামাজ অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে, যার প্রভাব সামাজিক সম্পর্কেও পড়ে। ঘরের ভেতর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে ওঠে।
পরিবারে সদাচরণ, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ক্ষমাশীলতা বাড়ে, ফলে সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধ কমে।

গ) সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা:

নফল নামাজ হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি করে, আর তাকওয়াই মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে। চুরি, প্রতারণা, মিথ্যাচার, অন্যায় আচরণের প্রবণতা কমে। সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

ঘ) সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি:

নফল নামাজ আল্লাহর প্রতি নৈকট্য বাড়ায়, আর ঈমান দৃঢ় হলে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হয়।

সামাজিক সেবায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় (গরিব-দুঃখীর সহায়তা, দান-সদকা ইত্যাদি)।
কমিউনিটিতে কল্যাণমূলক কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

ঙ) মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক আচরণ:

নফল নামাজ মানুষের মানসিক চাপ কমায়। শান্ত ও স্থির মন সমাজে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শনে সহায়তা করে। উত্তেজনা, হতাশা ও বিষণ্নতা কমে, যা পরিবার-সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।

চ) সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি:

নফল নামাজ নিয়মমাফিক আদায় করলে সময় ব্যবস্থাপনা ভালো হয়। দৈনন্দিন কাজে শৃঙ্খলা আসে। দায়িত্ব জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এগুলো একটি সুগঠিত সমাজ গঠনের ভিত্তি।

ছ) সমাজে আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি:

নফল ইবাদতকারী মানুষের জীবনযাপন হয় আলোকিত ও ইতিবাচক। তারা সমাজে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একটি আধ্যাত্মিক, শান্তিপূর্ণ ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

নফল নামাজ ব্যক্তিকে যেমন পরিশুদ্ধ করে, তেমনি পুরো সমাজকেই ইতিবাচক পথে পরিচালিত করে। ব্যক্তিগত আমল সমাজিক পরিমণ্ডলে শান্তি, নৈতিকতা ও সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক জীবনে নফল নামাজের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ৭: নফল নামাজের প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

১.নফল নামাজ ও বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ

ক)মানসিক চাপ ও বিষণ্নতা কমাতে নফল ইবাদতের ভূমিকা:

বর্তমান যুগে স্ট্রেস, উদ্বেগ, হতাশা ও মানসিক অস্থিরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নফল নামাজ—

-মনকে শান্ত করে।
-স্ট্রেস হরমোন কমায়।
-মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে।
-ঘুমের মান উন্নত করে।

ফলস্বরূপ এটি মানসিক স্বাস্থ্যকে স্থিতিশীল রাখে, যা আধুনিক যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

খ)প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা:

মোবাইল, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মনোযোগ ভেঙে দেয়, নৈতিকতা ক্ষয় করে এবং একাকীত্ব বাড়ায়।
নফল নামাজ—

-মনোযোগ পুনরুদ্ধার করে।
-স্ক্রিন আসক্তি কমায়।
-মানুষের মধ্যে নৈতিকতার জাগরণ সৃষ্টি করে।
-হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করে।

গ)নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ:

আধুনিক সমাজে প্রতারণা, অশ্লীলতা, সহিংসতা, দুর্নীতি ও নৈতিক পতন ব্যাপক।
নফল নামাজ—

-অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে।
-পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখার শক্তি দেয়।
-নৈতিকতা, সততা, দায়িত্ববোধ বাড়ায়।

ফলে ব্যক্তি ও সমাজ নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ হয়।

ঘ) পরিবারিক অশান্তি নিরসনে প্রতিকার:

আজকের যুগে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক অবহেলা, সন্তান সমস্যা ও ঘরোয়া অস্থিরতা বেড়েছে। নফল নামাজ—

-ধৈর্য উন্নত করে।
-রাগ কমায়।
-ক্ষমাশীলতা বাড়ায়।
-পরিবারের মধ্যে শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে।

এটি সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে অত্যন্ত সহায়ক।

ঙ) দ্রুতগতির জীবনে আত্ম-শৃঙ্খলা তৈরি:

আধুনিক জীবন ব্যস্ত, অগোছালো ও দৌড়ঝাঁপপূর্ণ। নফল নামাজ—

-সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে সাহায্য করে।
-শৃঙ্খলা বজায় রাখা শেখায়।
-দায়িত্বশীলতা বাড়ায়।
-মনোযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

এগুলো দ্রুতগতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানসিক দক্ষতা।

চ) *মানবিক মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি:*

সমাজে আজ মানুষ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, সহমর্মিতা কমে গেছে।
নফল নামাজ—

-আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বাড়ায়।
-মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি জাগায়।
-সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করে।

এটি মানবিক সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

ছ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি:

সমসাময়িক জীবনে চাপের কারণে মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।
নফল নামাজ—

-হৃদয়কে শান্ত করে।
-মন পরিষ্কার করে।
-বিচারক্ষমতা উন্নত করে।
-আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

ফলে ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

জ) আধুনিক জীবনের একাকীত্ব দূর করা:

আজকের মানুষের বড় সমস্যা একাকীত্ব, অন্তর্গত শূন্যতা ও বিষণ্নতা। নফল নামাজ মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর সাথে যুক্ত করে—

-সে আর একাকী বোধ করে না।
-জীবনে স্থিতি ও অর্থ খুঁজে পায়।
-উদ্বেগ কমে যায়।

ঝ) *কর্মব্যস্ত মানুষের জন্য অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন:*

কর্মব্যস্ত মানুষ নফল নামাজের মাধ্যমে—

-মানসিক শক্তি বজায় রাখে।
-আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে।
-কাজের মনোযোগ বাড়ে।
-ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
যা পেশাগত জীবনকে সফল করে।

২. নফল ইবাদতের অন্যান্য প্রকারভেদ:

১.নফল সালাত (ঐচ্ছিক নামাজ):

ফরজ ও সুন্নত নামাজের বাইরে যে সকল নামাজ আদায় করা হয়:

-তাহাজ্জুদ
-ইশরাক
-আউয়াবীন
-দুহা
-সালাতুত তাসবিহ
-সালাতুল হাজত (প্রয়োজন পূরণের নামাজ)
-সালাতুত তওবা (তওবার নামাজ)
-তাহিয়্যাতুল মসজিদ (মসজিদে প্রবেশের সালামি নামাজ) ইত্যাদি।

২. নফল রোযা:

রমজানের বাইরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে রোজাগুলো রাখা হয়:

-শাওয়ালের ৬ রোজা
-প্রতি মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের আইয়ামে বীজের রোজা।
-সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা

-আশুরার রোজা (৯-১০ মুহাররম)
-আরাফার দিনের রোজা
-শাবানের নফল রোজা

৩. *নফল দান-সদকা:*
অবশ্যক জাকাতের বাইরে যে দান-সদকা করা হয়:

-গোপনে দান
-মিসকিন-অসহায়দের নফল সহায়তা
-স্বেচ্ছায় ইনসানিয়তপূর্ণ কাজ (খাবার খাওয়ানো, কাপড় দেয়া, সাহায্য করা)

৪. নফল কুরআন তিলাওয়াত:

-অতিরিক্ত কুরআন পাঠ
-নফল তাফসির-তাদাব্বুর
-কুরআনের দোয়াগুলো পাঠ

৫. নফল যিকর ও দোয়া:

ফরজ যিকরের বাইরে:

-"সুবহানাল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ", "আল্লাহু আকবার", "লা ইলাহা ইল্লাহ" জিকির
-সকালে–সন্ধ্যার মাসনুন যিকর
-দরুদ শরীফ পাঠ
-তাসবিহ, তাহলিল, তাকবির

৬.নফল ওমরাহ:

হজ-বাধ্যতামূলক নয়—এমন অবস্থায় স্বেচ্ছায় ওমরাহ পালন।

৭. নফল তাকাফ্ফুর (মসজিদে ই'তিকাফ):

রমজান ছাড়াও অন্য সময়ে মসজিদে ইতিকাফে বসা।

৮. নফল খেদমতে খালক (মহৎ সেবা)

মানুষের উপকারকে ইবাদত হিসবে করা:

-পথ চলতি লোককে সাহায্য।
-অসুস্থের খোঁজ নেওয়া।
-সামাজিক উপকারমূলক কাজ।

৯. নফল শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন:

ইসলামী জ্ঞান আহরণ, কুরআন-হাদিস শিখা—এগুলোও নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

১০. নফল সালাম, হাসি, সৎ কাজের নির্দেশ:

-কাউকে সালাম দেয়া
-সুন্দর আচরণ
-হাসিমুখে কথা বলা
-নফল নেক আমল

নফল ইবাদতগুলি মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সহায়তা করে। এগুলি আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

৩. নফল ইবাদতের সঠিক প্রতিপালন :

ক) শুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে নফল ইবাদত:

নফল ইবাদতের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই প্রধান উদ্দেশ্য হতে হবে। লোক দেখানো, প্রশংসা পাওয়া বা উদ্দেশ্যহীনভাবে ইবাদত করা নফলের প্রতিফল নষ্ট করে দেয়।

রাসুল (সা.) বলেছেন: "কর্মসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি, মুসলিম)

খ) *ফরজ ইবাদতের পর নফল পালন করা:*

ফরজ ইবাদত প্রতিষ্ঠা না থাকলে নফল ইবাদত গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে। প্রথমে ফরজ সালাত ঠিক করতে হবে, এরপর নফল সালাত। ফরজ যাকাত না দিলে নফল সদকা যথাযথ ফল দেবে না।
ফরজ রোজা (রমজান) পালন না করলে নফল রোজার পূর্ণ ফযিলত পাওয়া কঠিন।

গ) সুন্নাহ অনুসরণ করা:

নফল ইবাদত করার সময় রাসুল (সা.)–এর পদ্ধতি মেনে করা উত্তম।
-তাহাজ্জুদের নির্দিষ্ট সময়
-দোয়া, যিকর, বসার ভঙ্গি
নফল রোযার দিনসমূহ
সুন্নাহ অনুযায়ী করলে নফল ইবাদতের মান ও ফল বৃদ্ধি পায়।

ঘ)নিয়মিত ও স্থায়িত্ব বজায় রাখা:

ইসলামে অল্প হলেও নিয়মিত আমলকে আল্লাহ ভালোবাসেন।
নবীজি (সা.) বলেছেন: "সবচেয়ে উত্তম আমল হলো যেটি স্থায়ী, যদিও তা অল্প হয়।" (বুখারি)
প্রতিদিন অন্তত কিছু নফল ইবাদত স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা উচিত।

ঙ*)বিনয় ও আন্তরিকতায় নফল ইবাদত:*

নফল ইবাদতে অহংকার বা আত্মপ্রশংসা স্থান পায় না।

-আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়া।
-নিজের গুনাহের কথা স্মরণ রাখা।
-অন্তরে ভীতি ও আশা উভয়টাই রাখা।

চ)সময় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীলতা:

-নফল সালাতে মনোযোগ—খুশু খুজু থাকা।
-নফল রোজায় গীবত, মিথ্যা, অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।
-যিকর-দোয়ার সময় মনোযোগ রাখা।

ছ) ইবাদতকে সহজসাধ্য রাখা:

নফল ইবাদত কখনও কষ্টদায়ক, আক্রমণাত্মক বা অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়।

-সুন্নাহ বিরুদ্ধ কঠোরতা নিষিদ্ধ।
-নিজের শরীর, পরিবার, অধিকার—এগুলো নষ্ট হয় এমন ইবাদত বর্জনীয়।
-নফল ইবাদত জীবনযাত্রার সাথে সমন্বিত রাখা উচিত।

জ)গোপনে নফল ইবাদত করা:

গোপন নফল আমল আল্লাহর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য।

-গোপনে দান
-গোপনে রাতে সালাত
-লোকচক্ষু এড়িয়ে যিকর করা
এতে রিয়া (দেখানো) থেকে বাঁচা যায়।

ঝ)ইলম অনুযায়ী নফল আমল:

যে ইবাদতের পদ্ধতি জানা নেই তা না করে সঠিক জ্ঞান অনুসারে ইবাদত করা জরুরি।

-ইলম অর্জন।
-আলেমদের থেকে মাসআলা জেনে নেওয়া।
-হাদিস ও সুন্নাহ অনুযায়ী অভ্যাস তৈরি করা।

ঞ) নফল ইবাদতকে জীবনের অংশ করা:

-প্রতিদিন কিছু সময় যিকর।
-সপ্তাহে অন্তত একদিন নফল রোজা।
-মাসে কিছু দান।
-রাতের একটু সময় তাহাজ্জুদের জন্য রাখা।
-প্রতিদিন কয়েক আয়াত কুরআন।

এগুলোকে জীবনযাপনের অংশ করলে নফল ইবাদতের স্থায়িত্ব ও গভীরতা আসে।

৪.নফল ইবাদতে গোপনীয়তা ও প্রদর্শন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"যে গোপনে সাদাকা দেয়, যে গোপনে নামাজ পড়ে, সে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"
(বুখারী ও মুসলিম)

অতএব, নফল নামাজ গোপনে আদায় করা অধিক উত্তম, কারণ এতে রিয়া বা অহংকারের আশঙ্কা থাকে না।

ক)*গোপন নফল ইবাদতের গুরুত্ব:*

নফল ইবাদত মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়।
আল্লাহ জানেন যা আমরা গোপনে করি। নবীজী (সা.) বলেছেন:

"সবচেয়ে বেশি সম্মানিত নেক আমল হলো গোপনে করা।"

গোপন নফল ইবাদত অন্তরের খুশু, বিনয় ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। উদাহরণ: রাতের তাহাজ্জুদ, গোপনে দান, একান্তে কুরআন পাঠ।

খ)প্রদর্শনের ক্ষতি:

যখন নফল ইবাদত মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয়, তখন তা রিয়া (প্রদর্শন) হিসেবে পরিগণিত হয়। রিয়ায় করা নেক আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। নবীজী (সা.) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য নেক আমল করে, তার প্রতিদান শুধু মানুষের কাছেই থাকবে।”

উদাহরণ: জনসমক্ষে নফল নামাজ অতিরিক্ত উচ্চস্বরে করা, দান দেখানো ইত্যাদি।

গ) সঠিক নফল ইবাদতের দিকনির্দেশনা:

- প্রধান উদ্দেশ্য: আল্লাহর সন্তুষ্টি।
-মনোযোগ ও খুশু: অন্তরে মনোযোগ, বাহ্যিক প্রদর্শন নয়।
-গোপন আমল: সম্ভব হলে একা, বা সীমিত জনসমক্ষে করা
-প্রদর্শন এড়ানো: মানুষ দেখুক, প্রশংসা পেতে চাইবে এমন চিন্তা দূরে রাখা

ঘ)সুন্নাহ অনুসারে প্রয়োগ:

নবীজি (সা.) অনেক সময় রাতে গোপনে সালাত করতেন। দান বা নফল আমল গোপনে করলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ পুরস্কৃত করেন।
জনসমক্ষে ইবাদত করা ফরজ বা সুন্নাহ হলে সমস্যা নেই, তবে নফল হলে গোপন করা উত্তম।

নফল ইবাদতের মূল সৌন্দর্য হলো আন্তরিকতা ও গোপনীয়তা। প্রদর্শন মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি দেয় না। সুতরাং, নফল ইবাদত সবসময় গোপনীয়ভাবে ও সত্যিকারের নিয়তসহ করা উচিত।

অষ্টম অধ্যায়ঃ উপসংহার

কুরআন ও হাদীস উভয়ের আলোকে নফল নামাজ ইসলামী ইবাদতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ফরজ ইবাদতের পূর্ণতা দান করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

নবী করিম ﷺ নিজ জীবনে নফল নামাজকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সাহাবারা তা অনুসরণ করতেন।

নফল নামাজ হলো মুসলমানের আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি অমূল্য অংশ। ফরজ নামাজের অতিরিক্ত এই ইবাদত ব্যক্তি ও সমাজে স্থায়ী রূপান্তর আনতে সক্ষম।

নবীজি মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বলেন:

"যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে এবং তার উপর নফল নামাজ সম্পন্ন করে, তার জন্য জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।" (সহিহ মুসলিম)

এ থেকে বোঝা যায়, নফল নামাজ শুধুমাত্র অতিরিক্ত ইবাদত নয়, বরং এটি মুসলমানের আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নফল নামাজের মাধ্যমে মনুষ্য তার হৃদয়কে পবিত্র রাখে, ধৈর্যশীল হয়, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বর্তমান আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও মানসিক চাপের মধ্যে নফল নামাজ ব্যক্তিকে একান্তিক সময়ে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভের সুযোগ দেয়। এটি জীবনকে সুন্দর, সুখী ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে।

সুতরাং, নফল নামাজকে উপেক্ষা করা নয়; বরং এটি প্রতিটি মুসলিমের জীবনের নিয়মিত অংশ হতে হবে। ফরজ নামাজের পাশাপাশি নিয়মিত নফল নামাজ আদায় করা ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন না, বরং তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মানও উন্নত হয়। এভাবে নফল নামাজ মুসলমানের আধ্যাত্মিক জীবনের অদ্বিতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং, একজন মুমিনের উচিত ফরজ নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজ নিয়মিত আদায় করা—কারণ এটি আত্মার শান্তি, আল্লাহর ভালোবাসা ও জান্নাত লাভের সহজ পথ।

—----------★—-------